কেমন আছেন

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
১ বৈশাখ, ১৩৬১

প্রচ্ছদ : শ্রীসুকান্ত রায়

প্রকাশক :
পূর্ণেন্দু বসু
আনন্দ নিকেতন, নববারাকপুর
২০২/২, রামকৃষ্ণ সরণী (অধুনা বিধানচন্দ্র রায় সরণী)
উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা ৭০০ ১৩৯

মুদ্রণ :
বাণী আর্ট প্রেস
৫০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০০০৯

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ৺লক্ষ্মীরাণী বসুর

শ্রীচরণে

উৎসর্গিত

নিবেদন

আত্মানুসন্ধানে ধরা পড়ে মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। এই ভালবাসা তার দেহকে ছাড়িয়ে প্রাণে— যে প্রাণ আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণকে জীবনভর দেখছে, উপলব্ধি করছে। পাখির গান, ফুলের শোভা আর গন্ধ. আলোর হাসি, বায়ুহিল্লোল, নদী আর সাগরের ঢেউ, ধ্যানমগ্ন অরণ্য-পর্বত, প্রাণী, নীল আকাশ—ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গান, সর্বোপরি মানুষের ভালবাসা—যার সামান্য ছোঁয়াতেই মাটি, মানুষ সবকিছুই হয়ে ওঠে সোনা—সোনার মত প্রিয়বস্তু—তাকেই তো মানুষ নিত্য খুঁজে ফেরে। যে পরশমণির ছোঁয়াতে সব সোনা হয়, তাকেই মানুষ অনাদিস্রোত বেয়ে অন্বেষণে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। জানি, না জানি—মানি, না মানি— সেই মনের মানুষকেই 'আমি' নিত্য খুঁজে ফিরি। তাঁকে উপলব্ধি করব বলেই 'আমি' ভাল থাকতে চাই। 'আমার' এই দেহ, মন ঠিক না থাকলে 'প্রাণের প্রিয় পাওয়া' ব্যাহত হয়—তাই এত উদ্বেগ। যাকে ঘিরে আমার আনন্দ—তাকে প্রাণের মত করে পাবার জন্যই উদ্বেগ—ব্যাকুলতা। 'সুখ কোথায়'—'ভাল থাকা' কাকে বলে—প্রশ্নগুলির উত্তর মানুষ যুগ যুগ ধরে অন্বেষণ করে চলেছে। সফল সন্ধানীরই মিলেছে প্রার্থিত সুখ। ঋষি, কবি, শাস্ত্রকাররা বলছেন আমাদের চাওয়া ঠিক হয় না বলেই দুঃখ পাই। অন্যভাবে বলা চলে, দুঃখকে আমরাই ডেকে আনি। জীবনপথে (সাধনার পথে) চলতে চলতে চাওয়াটি শুদ্ধ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের চাওয়া শুদ্ধ হয়েছিল। তাই জাগতিক চাওয়া তাঁর কাছে তুচ্ছ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী' (১২/১৪) কথাটি গৃহী যতক্ষণ গ্রহণ করতে না পারছেন, মনে হয় ততক্ষণ 'ভাল থাকা' বা 'সুখ-সন্ধান'-এর পথ মিলবে না। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন চরিত্র জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এরই সন্ধানে ফিরেছে।

চলার পথে জীবনকথামাধুরী-রসাস্বাদনের লোভজাত কাহিনীগুলি যখন যেমন এসেছে, লেখা হয়েছে। একান্তই আটপৌরে এর সাজ। কতটা সাহিত্যপদবাচ্য হয়েছে জানি না। সাহিত্য না হয়ে থাকলেও বৈঠকী গল্পরস কিছু থাকতে পারে। রসিক পাঠকজন তা ভাববেন। বিচারকাসে 'গুণলেশ' যদি না মেলে, থাকে কেবল 'দোষ'—তবে লেখকের আত্মসমর্পণ ভিন্ন গতি নেই।

প্রায় দশ-বারো বছর ধরে লেখাগুলি 'অক্ষরমালা' এবং অন্যান্য দু'একটি

স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি সূত্রে লেখাগুলি গ্রথিত করার তাগিদ এসেছে কিছু 'সহৃদয়' থেকে। কিন্তু নিজের কাজের প্রতি নিয়মিত অবহেলার অভ্যাস লেখকের বহুদিনের। অবশেষে ভাগবৎ কৃপায় তা গ্রন্থবদ্ধ হওয়ায় একটু স্বস্তি মিলল।

দীর্ঘদিনের ইচ্ছাটি পূর্ণ হবার লগ্নটিতে যার আনন্দ উৎসাহ হ'ত অপরিসীম, আমার পরম স্নেহভাজন সেই শিল্পী ভ্রাতুষ্পুত্র শৈবাল (রানা) 'নয়ন সমুখে' নেই— সে ঠাঁই নিয়েছে 'নয়নের মাঝখানে'।

এই গ্রন্থপ্রকাশে 'অক্ষরমালা' পত্রিকা এবং নববারাকপুর 'সাহিত্যিকা'র সদস্যবর্গের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। 'সাহিত্যিকা'র অধ্যক্ষ প্রবীণ সাহিত্যসেবী গবেষক বহু গ্রন্থপ্রণেতা আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত শ্রদ্ধেয় শ্রীকানাইলাল দত্ত মহাশয়ও গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য একাধিকবার আমাকে তৎপর হতে বলেছেন।

বহু পুরস্কারে সম্মানিত শিল্পী বন্ধুবর শ্রীঅরুণ বণিক আগ্রহভরে নানা বাধা সত্ত্বেও আমার অনুরোধ রক্ষা করে বেশ কয়েকটি 'স্কেচ্' করে দিয়েছেন। আমার সঙ্কল্প— লেখা আর ছবিতে আমরা দু'জন পাশাপাশি থাকি। এতে আমার অতিরিক্ত সুবিধে—লেখার ফাঁকি ধরা পড়লে পাঠক-পাঠিকারা অন্তত ছবিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শান্তিলাভ করবেন। প্রচ্ছদ ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ ও আখ্যানের চিত্ররূপের জন্য বন্ধুবর শিল্পীকে জানাই আমার হৃদয়ের ভালবাসা।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ-রচয়িতা আর এক অনুজ শিল্পী শ্রীসুকান্ত রায়ের জন্য রইল অন্তরের কৃতজ্ঞতা। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন। গ্রন্থটির শেষ মলাটের স্কেচ্টি শিল্পী শ্রীঅরুণ বণিক-অঙ্কিত।

গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ ও কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন বন্ধুবর সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রুফ্ সংশোধন ও মুদ্রণ ব্যাপারে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশেষ সহযোগিতা ও প্রেরণা দান করেছেন অনুজ সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ শ্রীআনন্দপ্রসাদ রায়। এঁদের দু'জনের প্রতি রইল আন্তরিক ভালবাসা। অনুজ বন্ধুবর সুলেখক ও সংগঠক শ্রীসোমেশ ভূঁইঞা গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেছেন। তাঁকে এজন্য সাধুবাদ জানাই।

পরিশেষে নির্ধারিত সময়ে গ্রন্থটির কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য বাণী আর্ট প্রেসের পক্ষে কথা-সাহিত্যিক শ্রীকালাচাঁদ ঘোষ মহাশয়কে বিশেষ সাধুবাদ জানাই। তৎসহ উক্ত প্রেসের কর্মীদেরও জানাই কৃতজ্ঞতা।

সূচীপত্র

একটি প্রশ্ন ১, প্রশ্নটি উপেক্ষার ৩, তারিণীশঙ্কর-কিরীটিকাঞ্চন-কথা ৫,
বিড়ম্বনা ৮, তামাসা ১২, ভাল থাকতে চাই কি? ১৪, মঙ্গলদার কথা ১৬,
তারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী ১৮, রাণীদিদি ২০, যোলো আনা ২২,
শ্যামাকান্ত হারে নি ২৪, কানুর কেরামতি ২৭, রাজার দুলাল ৩০,
দুঃখের তিমিরে ৩৩, শেষ কোথায়? ৩৬, অকিঞ্চনের বৈঠকে ৩৯,
সাবিনাশের কথা ৪৩, প্রাণকৃষ্ণ, সুনীতিবালা ও শিবশরণ ৪৬,
নিবারণের কথা ৫০, ভাল আছে অখিলেশ ৫৪, নিমেষের কুশাঙ্কুর ৫৮, অঞ্জন-
সুবাস চাই ৬৩, নিত্যপ্রিয় ৬৯, শৈলবালার সংসার ৭২,
ভগুয়ার ভাগ্য ৭৭, তরুবালার সংসার ৮২, রুদ্রকান্ত-কাণ্ড ৮৭,
অমরদার কথা ৯০, উদাসী হাওয়ার পথে ৯৩,
সুজনের স্বপ্ন ৯৭, ফুলমালা ১০১, মালতীর সংসার ১০৭,
মঞ্জুরাণীর কথা ১১২, সংসারের সু আর কু ১১৭,
যোগেনের কাণ্ডকারখানা ১২২,
শূন্য ও সমরজিৎ ১২৬

প্রথম অধ্যায়

একটি প্রশ্ন

সকাল ছ'টায় বাজারের থলি হাতে সবে বেরিয়েছি। গলিটা পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই এক মূর্তিমান ছাত্র বলছে, 'কেমন আছেন, স্যার? আরে মূর্খ, কাল বিকেলেই তো তোর সঙ্গে দেখা হল পোস্ট অফিসের সামনে—এরই মধ্যে ভুলে গেলি, 'কেমন আছি'। বাজার-রেশন বয়ে বয়ে নিচ্ছি, দিচ্ছি। ছেলে-মেয়েরা সাধ্যমতো পড়াশুনা করে আমাকে কৃতার্থ করছে। আমি ভালো থাকি অথবা আমাকে ভালো থাকতে হয়। তা না হলে গিন্নির পান, দোক্তা, জরদা, ব্রত-পার্বণের নিত্য ফুল-ফল এক প্রকার বন্ধই হয়ে যাবে। এই তো দুদিন হঠাৎ শরীরটা খারাপ করল অল্প জ্বরে। মেজ ছেলে বাজার করে দিয়েছে। তাই নিয়ে বাড়িতে অশান্তির একশেষ। খুঁটিনাটি কত কি বাদ গেছে। বিবাদ মেটাতে অগত্যা আমাকে ছুটতে হল তক্ষুনি বাজারে। বন্ধুবর চক্রবর্তী সেদিন বলেছিলেন সহানুভূতিবশতই 'ছেলেকে দিয়ে বাজারটা তো এখন করাতে পার।' অর্থাৎ আমার বোঝা বওয়ার কষ্ট কমিয়ে আমাকে ভালো রাখার ব্যবস্থা। খুবই ভালো। বললাম, তাতে বোঝা একটু কমলেও ছুটোছুটি সমানই থাকবে। বাদ পড়া জিনিস আনতে ছুটতে হবে। আর পয়সা যে এই বাজারে একটু সাশ্রয় হয়, তা তো বুঝতেই পারো। ধৈর্য ধ'রে বুঝে সমস্ত বাজারটা ঘুরে তবে বাজার করার অভ্যাসটা তো ওদের হচ্ছে না। কাজেই বোঝা বই। একটু খাটা ভালো—জান তো, সেদিন গিন্নি বললেন, রিটায়ার ক'রে খবরের কাগজে মুখ গুঁজে বসে থাকা খুব খারাপ। সকালে মর্ণিং ওয়াক্ হবে, বাজারটাও হবে। আর বিকালে তো তোমার বয়সী সবাই কেমন ছড়ি হাতে বেড়ান। অতএব দুধ আনা, রেশন ধরা, বৌমাদের ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করা তো আমার শতরকমের নিত্য কর্ম রয়েছেই। তারই সঙ্গে নিজের স্নানাহার প্রভৃতি ক্রিয়া সারতে হয় বুঝতেই পারছ।

এদিকে শারীরিক খাটনি দিয়ে শরীর ঠিক রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর বেসামাল হবার উপক্রম— সে কথা বোঝে কে, বোঝাবই বা কাকে— নিরুপায় হয়েই আপনাদের ধরেছি ঠেসে। না শুনিয়ে যেতে দিচ্ছি না।

মেজছেলের ছেলের অসুখ। ছেলে কোন মতে হয়ত বাজারটা ফেলে দিয়ে

বলে গেল— ব'সে আছ তো; ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা তুমি গিয়ে নিয়ে এলেই তো পার। অতএব ছুটতে হয়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই এমনি ধারা।

ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া, ছোটখাটো নাতি-নাতনি থাকলে ছুটি হলে স্কুল থেকে ফেরত আনা—এমন কি ছেলেদের জন্য মেডিক্যাল সার্টিফিকেট আনতেও বাপকে ছুটতে হয়। সন্তানবৎসল আপনাদের কেউ কেউ বলে বসবেন 'এতে অনুযোগের সুর কেন—আপনারই তো ছেলে-নাতি-নাতনি।' ব্যস্, এরপর আর কথা চলে না। কিন্তু এত কাণ্ডের মূল কথা এই খাটনিতে শরীর থাকছে না।

বাতের ব্যামো তো নিত্য সঙ্গী, তার সঙ্গে ছোটখাটো অসুখ-বিসুখ তো এখনো আমল দিই না। শয্যাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত পথ চলি—চলতেই ভালোবাসি। ঐ সময়টা অন্ততঃ রেহাই পাই 'কেমন আছেন' এর উত্তর দেওয়া থেকে।

'ভালো আছেন' শুনতে শুনতে এক এক সময় ভাবতে ভাবতে যাই—'ভালো আছি' এটা জেনে প্রশ্নকর্তারা মনে হয় বিস্মিত—তাই তো এই বয়সে 'ভালো থাকা'টা বোধ হয় ঠিক হয়নি। নিজেকে অপরাধী ভাবি। আজ তাই এই প্রশ্ন শুনে চট করে উত্তর দিতে পারি না। সঙ্কোচের সঙ্গে ভেবে উত্তর দিতে হয়। মনে পড়ে গেল—চাকরী শেষ হতে ছয়/সাত বছর বাকি—এরই মধ্যে এক হিতৈষী বার চারেক ঘুরে ফিরে পথে জিজ্ঞাসা করেছেন কবে রিটায়ার করছি। বলা বাহুল্য উত্তর শুনে তিনি খুশী হতে পারেন নি। 'একজন বলেছিলেন আপনি রাটায়ার করেন নি?' 'এর উত্তর দিতে গিয়ে একটু থতমত খেয়েছিলাম। পরে ভেবে দেখেছি প্রশ্নটা অমূলক নয়। কর্মক্ষেত্র যা এখন দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার একটু আগেই রিটায়ার করা উচিত ছিল।

কোন ছাত্র গতি কমিয়ে সাইকেলে বসে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন? —বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে ছাত্রটির সাইকেল চালাবার বাহাদুরিটা দেখানই যেন মুখ্য। সাইকেল থেকে নেমেও অনেকে যথাযথ সম্ভাষণ জানিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু 'ভাল থাকা' ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা আবশ্যক। ভাল থাকা'টা যে কত কঠিন তা ক্রমে বোধগম্য হচ্ছে—প্রথমটায় এই প্রশ্নকে নিছক মামুলি মনে হয়েছিল বলে অনুতাপ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশ্নটি উপেক্ষার

'কেমন আছেন' রোজ দুবেলা শুনতে শুনতে মনে হয় কথাটাই বুঝি বিদ্রূপ। কিন্তু সেদিন চমক ভাঙল যখন শুনলাম 'অমরবাবু আর নেই'। কতই বা বয়স, সবে পঞ্চাশে পা দিয়েছেন। ভালো চাকরি, সুখের সংসার। দেখা হলেই মিষ্টি হেসে 'কেমন আছেন' অথবা 'ভালো আছেন'—প্রশ্ন করতেন। আর বিশেষ কোনো কথা তার ঝুলিতে ছিল বলে মনে হয় না। কোনো কোনো দিন এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিরক্তির সঙ্গে ঘাড় নেড়ে চলে গিয়েছি। কখনও বা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার ভয়ে দ্রুত তাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ সদর্পে এটাই বোঝাতে চেয়েছি 'তোমার ঐ প্রশ্নটা মামুলি, যন্ত্রবৎ, প্রাণের স্পর্শ নেই।'

ফাল্গুনের এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় অমরবাবু একই ধীর ভঙ্গীতে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'কেমন আছেন'—উত্তর না দিয়ে, তার দিকে না চেয়ে দ্রুত পা ফেলে চলে এসেছিলাম। 'মনে মনে তার উদ্দেশে বলছিলাম দেখতেই তো পাচ্ছ, কেমন আছি, আবার নিত্য একই প্রশ্ন কেন?

পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শুনি অমরবাবু বিকেল পাঁচটায় মারা গেছেন। আকস্মিক হৃদ্‌রোগ। নীলরতনে ভর্তি করা হয়েছিল সকালে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে—ঘর-সংসার করছে। ছোট মেয়ে বি. এ. অনার্স পড়ছে। একমাত্র ছেলে শুভদীপ বি.কম. পাশ করে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছে। শুনে আশ্চর্য হলাম, মেধাবী শুভদীপ নাকি টাকার অভাবে কস্টিংটা পড়তে পারেনি। অথচ আমাদের একটিবারও বলেন নি এ অসুবিধার কথা। শুধু একটা নয়, সংসারের কোনো সমস্যার কথাই আমাকে কোনদিন বলেছেন বলে মনে পড়ছে না।

নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগলো। সংবাদটা শুনে তার বাড়িতে শেষ দেখা দেখতে গিয়ে চোখের জল আর সংবরণ করতে পারি নি। নিজেকে পাষণ্ড মনে হল—একটি গানের কলি কাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো—

'জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা,
মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল।'

হায়রে নিষ্ঠুর হৃদয়! মানুষ তোমাকে ভালোবেসেছে, তুমি তা ঘৃণাভরে

প্রত্যাখ্যান করেছ 'কৃত্রিম' বলে। তোমার খোঁজখবর প্রতিনিয়ত তারা নিয়েছে, তুমি তো তাদের কুশল জানতে চাওনি! এক-আধদিন ঐ প্রশ্নের জবাবে মামুলি ভাবে বড় জোর জিজ্ঞাসা করেছ 'আপনি ভাল তো'? কিন্তু ওটা তোমার অবজ্ঞাভরা প্রশ্ন মাত্র। কে যেন বললে—জীবনপ্রবাহে কত ফুল ঝরে ভেসে যায়। 'ফোটা ফুলের মেলা'র প্রতিটি ফুলই নিত্য নবীন; তাঁকে দেখ, পরশ কর। মুহূর্তের অবজ্ঞায় একটি সূর্যাস্ত দেখতে না পাওয়ার পুরনো বেদনাটা কেন জানি বুকে আঘাত হান্‌লো। অমরবাবুর দিকে, তার সংসারের দিকে তো একবারও চেয়ে দেখিনি। নিত্য তিনি আমার সংসারের সব খবর নিতেন। সঙ্কটে ছুটেও এসেছেন। আমার অহঙ্কারী হৃদয় কত সহজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তাঁর সব কুশল প্রশ্নই মামুলি, কৃত্রিম। আজ আর 'ভাল আছেন' প্রশ্নটাকে উপেক্ষা করতে পারি না। এ প্রশ্ন শুনলেই বুকে চমক জাগে।

তৃতীয় অধ্যায়

তারিণীশঙ্কর - কিরীটিকাঞ্চন - কথা

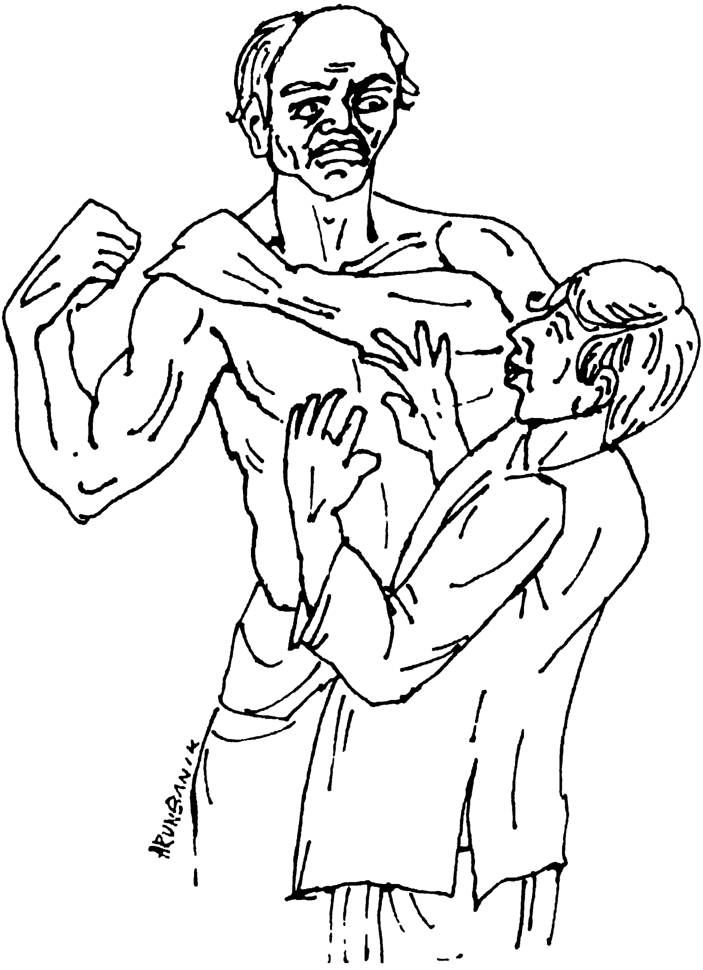
'কেমন আছেন' এর হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য ঘরে বন্দী থাকা ছাড়া আর পথ দেখছি না। জিতেনদা বয়সে আমার বছর দশেকের বড়। অবসর নিয়েছেন পাঁচ বছর হল —দুবেলা অনেকটা পথ পরিক্রমণ তার সুনিয়মিত। দেখা হতেই, একদিন বললেন, কেমন আছ, একী চেহারা হয়েছে! ভালো কথা নয়। ডাক্তার দেখাও। এখানেই থামেন নি। এই রকম কবে কার কি কি ঘটেছে তারও ফিরিস্তি দিয়ে চললেন একে একে। উত্তরে একবার 'ভালো' বলেই থেমে যাই। ভয়ে একটু চমকে উঠলেও শেষটা বিরক্তিই এল। ভাবছি কতক্ষণে ছাড়া পাব। পথ না দেখে শেষ পর্যন্ত—'আচ্ছা পরে কথা হবে' বলে পা বাড়াই।

আর একজন হিতৈষী তো একদিন প্রায় পথ থেকেই আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন চিকিৎসার জন্য তার পরিচিত ডাক্তারের কাছে।

এখন এমন অবস্থা হয়েছে কেউ 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই 'ভালো' ব'লে প্রায় না দাঁড়িয়েই পালিয়ে বাঁচি। রক্ষা এই বেশ কিছু হিতৈষী আছেন যাঁরা 'কেমন আছেন' প্রশ্ন করে দাঁড়ান না—উত্তরের জন্য তারা উদ্বিগ্ন নন।

তবে পাড়ার তারিণীশঙ্কর চৌধুরীকে দূর থেকে দেখলেই এড়িয়ে চলি, অর্থাৎ দেখা মাত্রই অন্য পথ ধরি। মনে আছে বার চারেক আমাকে পথে দাঁড় করিয়ে 'কেমন আছেন' প্রশ্ন করেই নিজের শরীর, সুস্বাস্থ্যর খবরকে কেন্দ্র করে তাঁর গৌরবময় দিনের স্মৃতিকথা শুনিয়ে ছেড়েছিলেন। ছেড়েছিলেন বললে ভুল হয়, আমাকেই একরকম জোর করে ছেড়ে আসতে হয়েছিল। পুলিশের কোন তদন্ত বিভাগের উচ্চপদে চাকরী করেছেন দীর্ঘকাল। সেদিন দেখা হতেই 'কেমুন আছেন? এত শুকিয়ে যাচ্ছেন কেন?' প্রশ্ন করেই নিজের ডান হাতের মাস্‌ল্‌টা একটু ফুলিয়ে বললেন—'দ্যাখেন, এই সত্তুরেও আমার ক্যামুন্ শরীল।' এরপর কৈশোর-যৌবনের শরীর চর্চার দীর্ঘ ইতিহাস— কর্মজীবনে শরীর স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল ভূমিকার বিবরণ শুনতে হল। তারিণীশঙ্করের একটা দিক আমাকে অন্তত বিব্রত করে, না—নিজের কথা শোনাতে ভালোবাসেন। অপরের কথা জিজ্ঞাসা দু'একটা করেই উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজের কথা অনর্গল বলে যান। তাই আমার অস্বাস্থ্যের কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু মুশকিল হল দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়, গা টন্ টন্ করে,

বাজার শুকিয়ে যায়—অসহায়ের মতো পথের দিকে চেয়ে থাকি। যদি কেউ আসে—তার সঙ্গে কথা বলার ছলে যদি পলায়ন সম্ভব হয়। মাঝে একদিন প্রতি কথায় সায় দিতে দিতে 'আচ্ছা চলি' বলে পা বাড়াতেই খপ করে হাত দিয়ে টেনে রাখেন



আমায়— শুন্‌ছেন—এবার শোনান কিভাবে স্কুল কলেজে কৃতী শিক্ষকরা পড়িয়েছেন তার কথা। কথা বলতে বলতে প্রায়ই তিনি Just a minute বলেন, কিন্তু দশ পনেরো মিনিটের কমে কোনোবারই ছাড়েন না।

তবে কিরীটিকাঞ্চন ঘোষালের কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতার কথা এ অঞ্চলে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। সে দিন ওপাড়ার রামরতন রায় বাজারে যাবার পথে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ভাল আছেন?' আর যায় কোথা! —'ভাল আছেন' কথাটার 'আছেন' কথাটা প্রথমে বিচার করতে হবে। 'থাকা' ব্যাপারটা কি? বিশ্বময় 'থাকা' বা 'আছি' কথাটার প্রকৃত অর্থ কি?

রামরতনের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ভাবছেন কি কুক্ষণেই না তিনি কথাটা জিজ্ঞাসা করে বসেছেন। এখন মুক্তি কতক্ষণে মিলবে কে জানে?

কিরীটিকাঞ্চন বলেন আমাদের থাকাটাই এক হিসাবে মিথ্যা—রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র। যা চিরস্থায়ী নয়, তার থাকাটাই মিথ্যা। আমরা সকলে আসলে এই থাকার মিথ্যা অভিনয়টাই করে যাচ্ছি। অতএব আমি 'কেমন আছি'. বলাটাই ভুল। কেননা আমি আছি কিনা সন্দেহ।'

সর্বনাশ। অনেক কষ্টে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনার সাময়িক অবস্থানের ব্যাপারটাই আমার প্রশ্নের বিষয়। রামরতন ভাবলেন এবার যা হোক একটা উত্তর পেয়ে ছাড়া পাবেন— কিন্তু তা হল না।

বললেন—দাঁড়াও, 'আমি কে' তার মীমাংসা চাই। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্ট জগতের সম্বন্ধ— আমার সম্বন্ধ কী—তা জানা আবশ্যক।

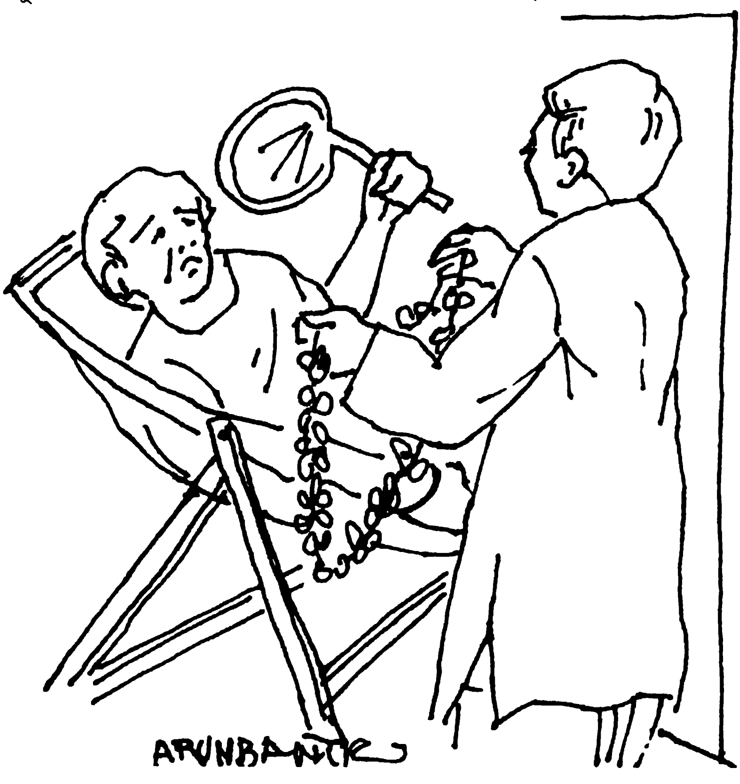
দর্শন উপনিষদের গভীরে তলিয়ে বিচারে বিচারে সময় দাঁড়াল আধঘণ্টা। শুনেছি অনেক মিনতিতে আর একদিন বিচারের সময় ধার্য করে রামরতন তার কাছ থেকে সেদিনের মত ছাড়া পেয়েছিলেন। রামরতন ভুলেও কিরীটিকাঞ্চনের পথ মাড়ান না। আর আমি তারিণীশঙ্করের গলি এড়িয়ে চলি। কিন্তু ঘুরে ফিরে যে পথেই চলি না কেন—মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। ব্যস্ততা দেখাবার চেষ্টা করি। বুঝতে পেরেই আজকাল বোধ হয় অল্পেতেই রেহাই দেন। 'ভাল আছেন?' বলেই নিজের দুটো একটা সংবাদ জানান আর দু'একটা অনুরোধ করে রেহাই দেন। পথ চলা যে কি কঠিন ব্যাপার তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন 'আমার ঘরে থাকাই দায়'—আর আমার দশা 'পথে চলাই দায়।' ঘর আর পথ—কাকে রাখব আর কাকে ত্যাগ করব ভাবছি— দুই-ই যে চাই। কিছু পথ, কিছু ঘর করেই কাটাতে হবে, ভাবছি।

চতুর্থ অধ্যায়

বিড়ম্বনা

বেয়াদব বেল্লিক বখাটে বৃন্দাবনটা আজ ইজ্জৎটা দিয়েছিল প্রায় শেষ করে। ভাগ্যিস কৌশলে কথার মোড়টা ঘুরিয়ে দিলেন সঙ্গী নুটুবিহারী। বলে কি না 'কালিদাস মিত্তির আর নেই'। শুনেই ছুটেছি একটা ফুলের মালা কিনে নিয়ে। বিষণ্ণচিত্তে মালাটা নিয়ে বারান্দায় উঠতেই দেখি মিত্তির মশাই খালি গায়ে আরামকেদারায় একখানা ভাঙ্গা হাতপাখা নিয়ে দিব্যি হাওয়া খাচ্ছেন।

'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করার আগেই হাতের মালার দিকে চেয়ে কালিদাস বাবুর প্রশ্ন—মালা নিয়ে কোথায় যাবে—সভা-টভা আছে না কি?



'আজ্ঞে না, এই আপনি গতবার পঞ্চায়েত জিতলেন— সেই থেকে তো আমরা কিছুই করতে পারিনি। তাই আমরা ঠিক করলাম, আর দেরি করা ঠিক নয়—আর কিছু না হোক একটা মালা অন্তত পরিয়ে আসি আজই।' একটু থতমত খেলেও চমৎকার সাজালেন নুটুবিহারী। রক্ষা পেলাম বটে—কিন্তু শিক্ষাটা হল চরম।

রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হল সন্ধ্যায়। সত্যেন ও বিকাশ কালিদাস মিত্তিরের সঙ্গে পথে দেখা হলে কেমন আছেন জানতে চাইলে কালিদাসবাবু বলেন—'আমি আর নেই, সব গেছে, এই খোলসটাই আছে।' বৃন্দাবন প্রথম কথাটা শুনে এসেই আমার কাছে তা হুবহু জানায়।

'কেমন আছেন' এর উত্তরে ভাল থাকার ব্যাপারটা খুবই আপেক্ষিক। অকিঞ্চন দত্ত বিপুল সম্পত্তি করেছেন। কলকাতায় দুটো মস্ত বাড়ি, একটা শিল্পের মালিকানা রয়েছে। মফঃস্বলে বিরাট বাগানবাড়ি—আমবাগান। ছেলে-মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত। নাতি-নাতনিদের অভাব কিছু নেই। কিন্তু তবু অকিঞ্চনবাবু বলেন 'কই আর ভালো—বড় নাতির ব্যবসা নাকি মার খাচ্ছে। ছোটো ছেলের জমিজমা নিয়ে অশান্তি। এদিকে অম্ল, বুকজ্বালা, উচ্চ রক্তচাপ—গৃহিণীর বাতের ব্যথা—ভাল কোথায়?'

আমাদের খুবই প্রিয় ছাত্র বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী যে মামাবাড়ি থেকে পড়াশুনা করত, তার অবস্থাটা জেনে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মামার রোজগার সামান্য। মামাবাড়ির হাটবাজার ও সংসারের অন্যান্য প্রায় সব কাজই সে করত। পড়া ফেলেও অনেক সময় ছুটতে হত কাজে। এর বিনিময়েই তার খাওয়া জুটত। পড়াশুনার খরচটা সে খবরের কাগজ বিলি করে, কখনও বা টিউশনি করে চালিয়েছে। মাঝে মাঝে এক আধ বেলা উপোসও তাকে করতে হ'ত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যখনই দেখা হয়েছে 'কেমন আছ'র উত্তরে বলেছে হাসি মুখে—ভাল, খুব ভাল। তার সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, নম্রতা খুবই আকৃষ্ট করে। অনেক দিন দেখা হয় না। শুনেছি সে এম. এ. পাশ করে সরকারী অনুদানে গবেষণারত। ছাত্র পড়িয়ে সংসারে বৃদ্ধা মা ও ভাইয়ের খরচ এরই মধ্যে চালায়।

পাশাপাশি দুজনের তুলনা করলে দ্বিধায় পড়তে হয়—ভাল থাকা কাকে বলে? ভেবে দেখেছি অনেক টাকাকড়ি মান-সম্মানেও ভাল থাকা যায় না ভাল থাকার কৌশলটি আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এর ঈশ্বরী পাটনি অন্নদার কাছে খুশীমত বর চেয়ে নেবার সুযোগ পেয়েও চেয়েছে শুধু 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' সে বুঝেছে 'অনেক সোনা' তার সুখটুকু কেড়ে নেবে। চাওয়ার শেষ নেই, তাই পেয়েও সুখ কোথায়? তৃপ্ত হতে পারার মধ্যেই যে

সুখ—একথা বুঝতে হবে, তবেই ভাল থাকা সম্ভব। ব্যাপারটা সহজ নয়, বেশ কঠিন। তাই সে দিন 'ভালো আছ' প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—বড় কঠিন কাজ, তবে চেষ্টা করছি ভাল থাকার।

বন্ধুবর সুখময় রায়ের ছেলে রত্নেশ্বর তার বন্ধুদের অবাক করে দিয়ে সেদিন বলছে তাঁদের আড্ডায়— তোদের কিস্‌সু হবে না। রোজ কাঁদুনি গাইবি, চাকরির আর ইন্টারভিউর। আমাকে দ্যাখ্। ঘুরছি ফিরছি খেল্‌ছি—'ডু ফুর্তি, নো চিন্তা'ই আমার জপমন্ত্র। খাসা আছি। বাবা-মা দুকথা বলবে? —কানে না নিয়ে চুপচাপ শুনে গেলেই হল।'

কঠিন তত্ত্বের মীমাংসায় সবাই যেখানে হিমসিম খেয়ে যায়, করুণাকান্ত কর কিন্তু অনেক সহজে তার মীমাংসা করে ফেলেছেন বহুদিন। এপাড়ার জ্যোতির্ময় গুহের বারান্দাটি 'তাসবাড়ি' রূপে পরিচিত। ছুটির দিন সকাল থেকে রাত দশটা, আর অন্যান্য দিন সন্ধ্যা থেকে রাত নয়টা বাঁধা রুটিন। যিনি যেমন পারেন যোগ দেন। করুণাকান্তের সাধনা দুশ্চর—গৃহিণীর ভর্ৎসনা, তাড়না সব কিছু হার মেনেছে। গৃহিণী ধার-দেনা ও ছোট ছেলেমেয়ে দুটির সাহায্যে টুকিটাকি কাজের বিনিময়ে অভাব মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। পাড়ার লোক মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট তিরস্কার করলেও সদাশিব অমায়িক সরল করুণাকান্তের তাসাসন টলাতে পারেনি। তার কথা—অভাব তো থাকবেই। মেটালেও যখন যাবে না, তখন আর বৃথা চেষ্টা কেন—বলেই পান-খাওয়া দাঁতগুলির একগাল হাসি। কোন কোন দিন আবার মেঝেতে হাত দিয়ে তাল ঠুকে গেয়ে ওঠেন 'আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি'—এর পরের অংশ কোনদিনই গাইতে শুনি নি। অর্থাৎ করুণাকান্তের দিন বৃথা কাটছে না। অনেকে তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ইত্যাদি বলেন। কিন্তু তিনি নির্বিকার। বোধ হয় দুঃখ-ব্যথাটা এড়িয়ে চলাটাই তার স্বভাব। আশ্চর্য মানুষ— কোন দিন কারো কাছে সংসারে তার অনুযোগ নেই। খাবার পেলে খান। না পেলে অনাহারেই কাটিয়ে দেন। এমন মানুষকে কত দিনই বা তিরস্কার করা চলে? এক এক সময়ে মনে হয়েছে, ভাল থাকার হয়ত এ-ও এক কৌশল।

আটাত্তর বছর বয়সের বিজ্ঞান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক দুবেলা ছড়ি হাতে বেড়ান, সোজা হয়ে দ্রুত গতিতে, স্বাস্থ্য অটুট। কেমন আছেন জিজ্ঞাসার প্রশ্ন ওঠে না। তবু প্রশ্ন করলে বলেন—খুব ভাল। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায়ই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অথচ হঠাৎ দুদিন তাকে বেরোতে দেখি নি। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ। রক্তচাপ ও হৃদযন্ত্র দুয়েরই ক্রিয়া ভালো নয়। আট মাস হয়ে গেল ঘরের বাইরে বড় একটা যান না।

সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছেন তারিণী চক্রবর্তী। অবসর-প্রাপ্ত আইনজ্ঞ।

সত্তর থেকে আশী বয়স পর্যন্ত একই উত্তর শুনে আসছি 'খুব ভাল'। ইংরাজীতে খুব তৎপরতার সঙ্গেই উত্তর দিয়ে থাকেন। কৌতূহল দমন করতে না পেরে এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা, আপনি তো সব সময়ই 'খুব ভাল' আছেন বলে আসছেন। একসময়ও কি আপনি অসুস্থ হননি বা সংসারের বিরূপ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়ান নি?'

তারিণীবাবু মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছেন— 'যে উত্তরে ঝঞ্ঝাট কম, সেটাই তো ভাল।' 'ভাল আছি' বললেই লোকের পর লোক আসবে আর আমার সব কাজ পণ্ড হবে। 'ভাল নই' বললে লোকের ভীড় বাড়বে। সবাই দেখতে আসবেন। তাদের সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অসুস্থ আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ব। এই দুই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আমাকে একটানা দশ বছর 'খুব ভালো' থাকতে হয়েছে, বাকী দিনগুলিতেও তা থাকতে হবে।'

পঞ্চম অধ্যায়

তামাসা

পথ-চলতি প্রথম আলাপে 'কেমন আছেন' বাঙালির সহজাত সম্ভাষণ। অনেক চেষ্টাতেও একে রোখা কঠিন। যন্ত্রচালিতের মতো এর উত্তর আমারও তৈরী থাকে। কিন্তু সেদিন কুঞ্জকুটিলবাবু যেভাবে আমাকে বন্দী করলেন আর তা থেকে মুক্তির জন্য আমার যে দুর্দশা ঘটল, তা ভুলতে গেলে যে সাধনা প্রয়োজন, তা আমার নেই।

বছর চারেক হল চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। অথচ এরই মধ্যে কেমন পাল্টে গিয়েছেন। শ্রাবণের একটানা বৃষ্টির পর সেদিনের আকাশ অনেকটা পরিষ্কার ছিল। তাই বেরিয়েছি দুচার জনের খোঁজ-খবর নিতে। পথেই দেখা তার সঙ্গে। বেড়াবার লাঠিটি হাতে। 'কেমন আছেন' কথাটা শুনে আমার দিকে চোখ দুটি বড় করে চেয়ে কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে খপ্ করে আমার বাঁ হাতটি বেশ শক্ত করে ধরে টেনে নিয়ে চললেন তার বাড়িতে। —'তামাসা পেয়েছ?' কেমন আছেন!' —গলার স্বর পঞ্চম ছাড়িয়ে আবো দূরেই ক্রমশ বিস্তৃত হল— দেখ্‌বে এসো। দেখলাম স্ত্রী জ্বরে কাতরাচ্ছেন। পাশের ঘরে ছোট মেয়েটাও কাশি-জ্বরে কাতর। ছেলেটা রান্না করছে। ওষুধের শিশি দেখালেন দুই দুটো। হাত তখনো ছাড়েননি। বেশ দ্রুতপদে সব দেখাচ্ছেন। আমাকেও সঙ্গে সঙ্গেই পা ফেলতে হচ্ছে। ছাড়লে পালাতে পারি আশঙ্কা করেই মনে হয় হাত ছাড়ছেন না।

এবার একটু হাঁফাতে হাঁফাতে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার সামনে বসলেন। 'ওষুধ মাসে কত লাগছে জান? দেড়শ —এই দেখ' বলেই ওষুধের ক্যাশমেমোগুলি বের করে দেখান।

পথে একটি মেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল, 'দাদা ভালো আছ?' মেয়েটার বয়স তেরো-চোদ্দো হবে। দুটো হাতে ভর দিয়ে ব'সে ব'সে চলে, কারণ জন্ম থেকেই ওর দুটো পা অকেজো। আমি এবং আমার বন্ধুরা প্রায় রোজই ওকে দু'চার পয়সা দিই। তাই ও আমাকে চেনে। 'দাদা ভালো আছ'র উত্তরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর খবর কি?' শুনে বলল 'ভাল'।

হায় রে বিধাতা! দুটো হাতের উপর ভর করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাকে নির্মম কষ্ট করে চলাফেরা করতে হয়, সেও বলে কিনা 'ভাল'?

মনে পড়ে গেল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মিষ্টি গানের সেই লাইন দুটো 'সাবিত্রী সীতার দেশে দাও তুমি ধরা এসে, দূর করে দাও এই অনাচার।' স্টেশনে নামতেই নিত্যযাত্রীদের একজন পাশ থেকে বলে উঠল 'সুবাস কেমন আছ?' অনেক কষ্টে গানের কথাগুলি ভাবতে ভাবতে বললাম, 'ভাল'। কিন্তু সত্যি কি তাই?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাল থাকতে চাই কি?

'কেমন আছেন' প্রশ্নটার উত্তরে কেন যে সঙ্গে সঙ্গে একটুও চিন্তা না করেই 'ভাল' এই উত্তব কতবার দিয়েছি, তার হিসেব নেই। সেদিন হঠাৎ উত্তরটা দেবার পর চিন্তা হল— কেন মিথ্যা উত্তর দিলাম। ছিঃ ছিঃ, আমি তো ভাল মোটেই নেই। অম্বলের অসুখ, বাতের ব্যথা আর মানসিক দিক দিয়েও কিছুটা বিপর্যস্ত। যাদের জন্য সংসারে ভেবে সারা—একটু অসুবিধা না হয় ওদের, সেই চিন্তায় যতটা পেরেছি নিজেকে নিযুক্ত রেখেছি। কিন্তু আজ জীবন-সায়াহ্নে দেখছি তারা স্বাধীনভাবে যার যার পথ ধরেছে। এটা ক' র না, ওটা ক' র না বললে বলে, এখন আমরা কি ছোট, কেবল শাসন কববে! তোমবা বোঝ না কিছু, এক একখানা কথা বলবে! এবপর আর কথা বলা চলে না।

চুপ ক' রে থাকি। কলেজের পড়া, পড়ানো, গান শেখা, শেখানো, বেড়ানো সব ব্যাপারেই আজ ওদের মতান্তর। কিছুই কি তবে আমাদের আর শেখাবার নেই ওদের? ভাবতে একটু মনস্তাপ আসে। ওদের খেয়ালে চলে ওরা দুঃখ পাচ্ছে দেখছি, তবু কিছু করার নেই। এ অবস্থায় ভালো থাকাটা সোজা নয়। শারীরিক ভালো এ বয়সে কখনই পুরোপুরি আশা করা যায় না। তবু মানসিক দিক থেকে ভালো থাকা যেত অন্তত। কিন্তু তা হল কই? আমার প্রিয় ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি সুখে থাকুক— সতত তারই চিন্তা, তারই জন্য একরকম প্রাণপাত করেও দেখছি তারা সব মন্দ ঠাওরাচ্ছে অথবা নির্বোধ ভাবছে। একে কি ভাল থাকা বলে?

অথবা এটাই হয়ত ভালো থাকা। কোনও যন্ত্রণা, উপদ্রববিহীন ভাল থাকায় তো ভাবনা নেই। ভাবনাবিহীন ভালো তো মামুলি ব্যাপার। তা তো ঘটনার পর্যায়েই পড়ে না। রসসৃষ্টির ব্যাপারটাতেই তো আঘাত - দুঃখ-ব্যথা অপরিহার্য। এমনি করে তাই সুখের মধ্যে আসে আঘাত-দুঃখের অভিঘাত। আর ভাবব না। কি দরকার ভেবে ওদের জন্য? চায় না যখন আমাদের, কি হবে ভাবনায়? কবিগুরুর একটি গান মনে পড়ছে— 'তোমার কাছে শান্তি চাব না/থাক না আমার দুঃখ-ভাবনা।"

শান্তি-সুখ চাইতে গেলেই বিপদ। তা তো সংসারে দুর্লভ। তার জন্যই ছুটোছুটি। অথচ তার দেখা মেলে কই? তার দেখা মেলে যাতে, তার আয়োজনই বা করি

কোথায়? আমাদের অবস্থাটা তো—জড়াযে আছে বাধা/ছাড়ায়ে যেতে চাই/ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে। ভাঙাচোরা যা সংসারে আছে তা নিয়েই থাকতে ভালোবাসি। ফেলে দিতে মন সরে না। যার সঙ্গে মায়িক সম্বন্ধ, তা তো দুঃখ আঘাত দেবেই। তা জেনেও তো আমি আমার প্রিয় এদের জন্য একের পর এক ভাবনা ভেবে চলেছি।

আসলে দুঃখ নিয়েই থাকতে ভালবাসি। এ অভ্যাস বোধ হয় একটু ব্যাপক। যে আঘাত, যে ব্যথা আসছে, তা যে আমার চাওয়া—তা এতদিন ভাবিনি। আজ একটু অনুভবের ছোঁয়ায় স্পষ্ট হয় নিজ হাতে গড়া সেই বিপদজাল। এই ব্যথার স্বর্গকেই তো আমি ভালবাসি। সেই ভালবাসাই তো ডেকে এনেছে এত ব্যথা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। বোধ হয় অনুক্ষণ এই ব্যথা-বেদনা এক রমণীয় বিরহবোধ জাগায়। দুঃখের অন্তস্তলের এই বিরহ বা ব্যথাই খুঁজে ফিরি নিত্য দ্বারে দ্বারে। অথচ আমি ভালো থাকতে চাই। আশ্চর্য এক প্রতিকূলতাকে বাঁচিয়ে চলেছি—ভালো না থাকারই জীবনব্যাপী মহা আয়োজন। তবু ভালো থাকব? এ যে পরম পরিহাস—এ যে প্রতারণা! 'ভাল আছেন' প্রশ্নের উত্তরে তাই 'হ্যাঁ' উত্তরটিতে বুঝেছি ভুল নেই। আমি তো আসলে ভাল থাকতে চাই না অথবা বলা চলে যন্ত্রণাসহ কিছু মন্দ থাকার মধ্যেই তো আমি ভাল থাকি। সে অর্থে আমি তো ভাল আছি। ভাবনাটি আজ আমাকে অন্তত আপাত মিথ্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

মঙ্গলদার কথা

ভাল থাকার এক অত্যাশ্চর্য নমুনা দেখেছি কালীঘাটের মঙ্গলদার জীবনে। মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চ কুলজাত অভিজাত পরিবারের মানুষ। অকৃতদার সন্তান মাতৃসাধক মঙ্গলদা আপন পরিবারের একটি বইয়ের দোকান চালাতেন। তাঁর শেয়ার ছিল ৫০%। ভালই চলত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাঁর শরীর অপটু হয়ে পড়লে নিয়মিত কাজ করতে পারতেন না। বাড়ির সবাই অকর্মণ্য মঙ্গলদার প্রতি সংসারের চলতি রীতি অনুযায়ী অনাদব উপেক্ষা করতে লাগল। দোকানঘরের এক চিলতে জায়গায় তাঁর শয়ন— দোকানঘরের ঝাঁপ বন্ধ করলে জানলা দরজা না থাকায় সেখানে আলো-হাওয়া বন্ধ। বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া সব সময় পাওয়া যেত না। গরমকালে দেখেছি একখানা হাত পাখা হাতে খালি গায়ে হাঁটুর উপর কাপড়টা তুলে পায়চারি করছেন। মশার কামড়ে বসাও কঠিন হয়ে পড়ত বিদ্যুৎ বন্ধ হলে। দোকান-সংলগ্ন বাড়িতে কেন থাকতেন না জিজ্ঞাসা করিনি। দিনের বেলা খাবার জন্য ভিতর বাড়িতে যেতেন। রাত্রে খাবার দোকানেই



আসত। দোকানের পিছন দিকটায় ছিল স্নানাগার ও শৌচালয়। কাজেই বাড়িব কাউকে খুব একটা ডাকাডাকি করতে হত না। মাঝে-মধ্যে ডাকাডাকি করলে (বিরক্তি ভ'রে) তারা অবশ্য তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে যেত। শেষের দিকটা প্রয়োজন হলেও ডাকাডাকি করতেন না। পরিচিত পাঁচজনের সাহায্যে নিজের প্রয়োজন মেটাতেন—নতুবা পড়ে থাকতেন শয্যায়। একটা মাদুর, পাতলা তোষক, চাদর, একটা বালিশ আর মশারি। তাঁর এই বিছানা ও একটা থলিতে জামাকাপড় নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে পাড়ি দিতেন তারাপীঠে। ওখানে ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীর আস্তানায় অবস্থান কয়েক মাস। ফিরে আবার কলকাতার ঐ দোকানে এসে থাকতেন। শেষের দিকে কলকাতার বাড়িতে আর আসতে দেখিনি। এখন আশি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে আছেন তারাপীঠেই। শুনেছি তার ভ্রাতুষ্পুত্র মাসে মাসে টাকা পাঠান। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর শারীরিক কষ্ট চলেছে—অথচ দেখা হলে কুশল প্রশ্ন করলে আনন্দে তাঁর দুচোখ বেয়ে ঝরে অশ্রু। বলেন 'মায়ের কত খেলা দেখছি—প্রাণ ভরে উঠছে।' এদেহটা ভাল আছে—খুব ভাল রেখেছেন মা। উঠতে বসতে কষ্ট হয়—নিজের কাজটুকু পর্যন্ত করতে পারছেন না, তবু কেউ গেলে 'জয় মা' বলে লাফিয়ে উঠে হাসেন।

সামান্য একটু সেবা-যত্ন করলে কী খুশীই না হন! আবার পড়ে আছেন, কেউ নেই—তাও নির্বিকার। এ কেমন ভাল থাকা, কে জানে? মধ্যে মধ্যে খবর পাই মুমূর্ষু অবস্থা! আবার খবর আসে, ভাল আছেন— মা ভাল রেখেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

তারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী

সংগ্রামই জীবন। পরাজয় প্রতিরোধই সংগ্রাম। আর জীবনের প্রতি ভালবাসাই এই সংগ্রামের প্রেরণা। কিছু আনন্দ, সুখ ফোটাতে পারাই ভাল থাকা। তারাপ্রসন্নের সদাপ্রসন্নতা এ অঞ্চলের সকলকে বিস্মিত, অভিভূত করেছে। অল্পকাল হল তিনি লোকান্তরিত। সরকারী কলেজে কিছুকাল কাজ করেও অধ্যাপকের পদ পান নি ভৌত বিদ্যায় এম্ এস্‌সিতে কম মার্কের জন্য। শুনেছি মেধাবী তারাপ্রসন্ন পরীক্ষায় উত্তর ভাল লিখেও জনৈক অধ্যাপকের হাতে কম পেয়েছেন। পরে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। সুখ্যাতির সঙ্গে অধ্যাপনা শেষ করে সাতাশী বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারে বিধবা বোন, তিন ভাইয়ের সঙ্গে নিজ পরিবারের চার ছেলে এক মেয়েকে প্রতিপালন করতে হয়েছে। এগার বছর আগে স্ত্রী-বিয়োগের ঘটনা তাঁকে চরম আঘাত হেনেছে। তার আগে মেজ ছেলে আকস্মিকভাবে কঠিন অসুখে মারা যায়। পুত্রবধূ ও তার দুই পুত্র এক কন্যাকে প্রতিপালনের দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়েছে। তাঁর এক ছেলে চণ্ডীগড়ে চাকরী করে। সপরিবারে সেখানেই থাকে। সংসার চালিয়ে বাপ-মাব জন্য কিছু দিতে পারে না। মাঝে মধ্যে দু'একটা কাপড় হাতে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। অপর এক পুত্র কাছাকাছি বাড়ি তৈরি করে সপরিবারে বাস করছে। বাকি দুই পুত্র উল্লেখযোগ্য চাকরী কিছু করে না। পড়াশুনাও খুব বেশি কিছু করে উঠতে পারে নি। এদের ছেলেমেয়েদের প্রায় সব দায়-দায়িত্বই তিনি আজীবন বহন করে গেছেন।

অবসর গ্রহণের পর প্রায়ই দেখা হত পথে। ওষুধের শিশি হাতে ফিরছেন, নয় তো বাজার হাতে। কেমন আছেন প্রশ্ন তাঁকে না করাই ভালো, তবু স্বভাবের দোষেই করি। উত্তরও মেলে 'ভালো... আপনি কেমন?' বিনীত, শান্ত কণ্ঠ, মুখে মৃদু হাসি। একটু অনুতাপের সুরে বলেন 'আর বলবেন না, কর্মভোগ রয়েছে। একটু পড়াশুনা, পড়ানো নিয়ে থাকতে পারলে ভাল হত। অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে, সামলাতে হয়, সময় তেমন পাইনে। আপনারা কত তৈরী করছেন!'

আমার কথায় ওঁর কথা থামাতে হয়, 'আপনি যা তৈরী করেছেন আর এখনও

ফাঁক পেলেই করছেন, তা থেকে আমরা অনেক দূরে। এখানে প্রায় ঘরে ঘরে ছাত্ররা আপনার কথা বলে।' একটু অন্যমনস্ক হন। আহ্বান জানান তাঁর ওখানে যাবার জন্য। অনেক স্বপ্ন-সাধ তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেছে একথা বলেছেন একান্তে। অবসর জীবনটা কিছু ছাত্র নিয়ে অধ্যয়ন, গবেষণায় কাটাতে চেয়েছিলেন। অভাব ও সংসারের দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য তা হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে কিছু ছাত্র পড়িয়েছেন—প্রায়ই সংসারের বাধা এসেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার কোনোদিন কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নি। আমরাই এক এক সময় বিরক্ত হয়ে ছেলে কর্তব্য পালন করেনি বলে অনুযোগ করেছি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছেন সে চেষ্টা করে সাধ্যমতো কিন্তু পেরে ওঠে না। একটু হেসে বলেন, ওর দোষ নেই। ললাটের লিখন আর কি!

শিক্ষা-সংস্কৃতির কথায় খুব আনন্দ পান। সংস্কৃত শাস্ত্রাদির কথা উঠলেই আপন স্মৃতি থেকে বেশ খানিকটা উদ্ধার করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। এসব কথা বলতে ভালবাসতেন। কিন্তু ছেলেদের সংসারের কাজে ওঁকে সাহায্য করতে হয়। তাই আমরা বিলম্ব না করে অনেক দিনই উঠে পড়েছি। সংসারে যাকে ভাল থাকা বলে, তা তাঁর জীবনে ক্বচিৎ বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো মিলিয়ে গেছে। অথচ তিনি সদাহাস্যময়। ভাল ছাড়া মন্দ কোনো সময়ের জন্যই নন, অপরের কুশল সংবাদ শুনতে অধিক আগ্রহী তিনি।

নবম অধ্যায়

রাণীদিদি

নবনীদাকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেখেছি। বছর তিনেক হল তিনি লোকান্তরিত। শান্ত, সরল, সহৃদয় মানুষ। চার ছেলে, এক মেয়ে। কন্যার বিবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন যথাকালে যথাযথরূপে। তারা সুখে আছে। বড় ছেলে বাংলার বাইরে ভালো চাকরী করে। ছোট ছেলে বারাকপুরের বাড়িতেই থাকে। কন্যা ও পুত্রবধূ নৃত্যগীতনিপুণা। এক পুত্রবধূকে নবনীদা শিশুদের একটি বিদ্যালয়ে নিযুক্ত দেখে গেছেন। অপর পুত্রবধূ বাড়িতেই গানের স্কুল করেছেন। কষ্টের সংসারে সবে দুই ছেলের চাকরী হয়েছে। সুখের একটু মুখ দেখতে না দেখতেই রেল দুর্ঘটনায় এক ছেলের প্রাণ গেল। দু'বছর বাদেই আকস্মিক ব্যাধিতে অপর এক পুত্রের মৃত্যু। একপুত্র বিয়োগের শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই অপর পুত্র হারাবার বেদনা। বিশেষত যত্নে লালিত পুত্র যৌবনে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে সবে চাকরী আরম্ভ করার পর এই মৃত্যু। মর্মান্তিক এই বেদনা কল্পনায় আনাও কঠিন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর সহধর্মিণী—আমাদের সবার রাণীদি কীভাবে না এই শোক সংবরণ করে হাসিমুখে সব কর্তব্য পালন করে চলেছেন!

প্রথম পুত্রের মৃত্যুর চারদিন পর ঠাকুরবাড়ি থেকে ফেরার পথে দেখা। আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন স্মিত হাসিতে 'ভাল আছ'? আমি দূর থেকে দেখেই ভাবছিলাম কীভাবে কথা আরম্ভ করা যায়। মাসখানেক বাদে আরও কয়েকজন মহিলার সঙ্গে দেখা। উচ্চস্বরে সবাইকে কীসব শাসন করতে করতে চলেছেন। তিনমাস বাদে মন্দিরের উৎসব। পুরো দায়িত্ব প্রায় একাই বহন করলেন। ফল কাটতে দেরী দেখে বটি কেড়ে নিয়ে নিজেই কাটতে শুরু করেন। কাকে কোন্ কাজে বসালে দ্রুত তা সুসম্পন্ন হবে, তা ভাল জানতেন। সেই অনুযায়ী ভক্তদের নিয়ে তিনি উৎসবের কাজ যেভাবে সমাধা করলেন, তা হাঁ করে চেয়ে দেখলেন সবাই। আনন্দপুরীর নির্মলাদির স্বামীর অকাল বিয়োগে তিনি এসে যেভাবে সব সামলাচ্ছেন তা আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে। একদিন ভয়ে ভয়ে কথাটি পাড়লাম—আপনার এই অবস্থায় এত শক্তি কোত্থেকে পান? হাসি মুখে মন্দিরের ভিতরের মানুষটিকে দেখিয়ে নত হয়ে করজোড়ে বলেন, সব শক্তি ওখানে।

দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু যে দুঃসহ আঘাত হানতে চেয়েছিল তা সম্পূর্ণ প্রতিহত হল। নির্বিকার তিনি। প্রতিবেশী—প্রতিবেশিনী সকলেই অবাক। দেখা হয়েছে এরপর অনেকবার, তার বাড়িতেও গেছি। বয়স সত্তর, কর্মশক্তি ও স্বভাবে তাঁর তারুণ্য। কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করেছি এরপর মাঝে মাঝে। হেসে বেশ জোরের সঙ্গেই উত্তর দিয়েছেন, খুব আনন্দে আছি। বাইরে প্রণাম নিতে চান না দিদি। অন্তরে তাঁকে বার বার প্রণাম করি। সাধক কবির বাণী মনে পড়ে—'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' এ কাতর প্রার্থনা তাঁর কাছে পৌঁছেছে, তাই শক্তি জেগেছে। আর এক মরমী কবির গানটি মনে পড়ে যায়—'যে ফেল্‌বে তোরে বানের মুখে, সেই তো তরীর কর্ণধার। মনরে আমার, তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।'

আজ কিছুটা অনুভব করতে পারি ভালো থাকা কত কঠিন ব্যাপার। প্রয়োজনকে যিনি যত অধিক সীমায়িত করতে পারেন, তিনিই তত ভালো থাকার পথের সন্ধান পেয়ে যান। এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ভক্ত রুইদাসের কাহিনীটি অতি সাধারণ স্তরের মানুষের কথা ব'লে বার বার মনে পড়ে। সদয় সাধুটির দেওয়া পরশ পাথর ঘরের চালে গোজাই ছিল। রুইদাস তা স্পর্শও করেননি। স্পর্শমণির সাহায্যে রুইদাসের অবস্থা ফিরেছে মনে করে সাধু এসে দেখেন রুইদাসের দারিদ্র্য ঘোচেনি। স্পর্শমণি তিনি যেখানে রেখেছিলেন সেখানেই আছে। করজোড়ে রুইদাস সাধুকে জানান 'দুঃখ ঘুচলে যে আমি আমার দুঃখের ঠাকুরকে হারাব!'

কিন্তু মৃত্যুর আঘাতে অবিচলিত থাকা— সে তো আরো কঠিন সাধনা। সে সাধনা মানুষের অনায়ত্ত নয়—তার প্রমাণ আমার রাণীদিদি।

দশম অধ্যায়

ষোলো আনা

ভাল আছি, আপনারগে আশীব্বাদে বেশ আছি। বুড়ো মা আর ভাইডা
দেখতি হয়। আর মেয়ে বউ নিয়ে আছি। তা বউ একখানে কাজ করে এট্টু, মা
ধরেন দু'শ টাকা পায়। 'পাউডারের তুলো' তৈরি করে।

খগেনের কথা থেকে বুঝলাম তার বউ পাউডারের 'পাপ' তৈরি করার কা
করে। বিশ বছর ধরে খগেন রিক্সা চালাচ্ছে। বটতলা থেকে সাজিরহাট পর্যন্ত ন
বারাকপুরে সকাল-সন্ধ্যায় তার দেখা এক-আধবার পাওয়া যায়। এক যাত্রী নি
সতীন সেন নগরে রেল লাইনের ধারে এসেছিল। আমি ওপার থেকে ফিরছিলাম
দ্রুত যেতে হবে সাজিরহাট হয়ে শ্রীপুর। ওকে পেয়ে সুবিধে হল। আমাকে পে
ও দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলে। এর আগে অনেকবারই বলেছে। সততা ও মি
ব্যবহারের জন্য সবাই ওকে ভালোবাসে। কতদিন কত দামী জিনিস কত মানু
ফেরৎ পেয়েছে তার হিসেব নেই। ঝড়-বাদল দুর্যোগেও বেশী ভাড়া কখনও চা
না। অনেকে জোর করেই দেয়। পূজোর কটা দিন শুধু একটাকা বেশী ভাড়া নেয়
সাজিরহাটের ওপারে শহীদবন্ধু নগরে খগেনের বাড়ি। তালবান্দার তারক কু
মশাইয়ের রিক্সা চালাত। কুণ্ডুমশাই মারা যাবার আগে ওকে রিক্সাটা দান কর
যান। ওর মুখে শুনেছি— রোগশয্যায় শুয়েই একদিন ওকে ডেকে বলেন, 'খগেন
ছেলেটাকে বড় স্কুল-কলেজে পড়াবে—ও অনেক বড় হবে, তোমার দুঃখ ঘুচাবে
এ গ্রামের মুখও দেখো ও উজ্জ্বল করবে। আজ থেকে ও রিক্সাখানা তোমার
তোমাকে দিলাম। ওই রিক্সাই তোমার ছেলেকে মানুষ করবে। শুধু সৎপথে থেকে
বাবা, মানুষকে ঠকিও না। তোমার ভালো হবেই।'

কতবার কুণ্ডুমশায়ের স্নেহভরা কথাগুলো সুর করে বলতে বলতে ও চোখের
জল ফেলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কত সময়ে রিক্সায় চড়েছি পনেরো বছর
ধরে। অথচ ওর ছেলে যে মরে গেছে তা একবারও এতদিন বলেনি। আট বছর
আগে ওর বারো বছর বয়সের ছেলেটি মারা গেছে। অল্প দিন হল জেনেছি ছেলের
মৃত্যুর খবরটি। কেউ বলে নিউমোনিয়া, কেউ বলে টাইফায়েডে মৃত্যু হয়েছে
চিকিৎসা-বিভ্রাটের কথাও শোনা গেছে। আজ ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করতেই একটা
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও বলল. 'আজ থাকলি ও আপনাগো আশীব্বাদে কলেজে

পড়ত। নিমনি হল, ডাক্তারি ধব্‌তি গোলমাল করলে। নেউতি—সবই নেউতি। নলাট্ নেকা খণ্ডাবে কে?'

একটু থেমে ও আরো কত কথাই না বলতে লাগল। ও বলেছে বেশি আশা



করা ঠিক নয। কাজ করে যেতে হবে। যেটুকু পেলে ভাল, মাথায় তুলে নাও। যে দুঃখ পেলে তাকে অবজ্ঞা ক'র না। ও বলল 'সুখ যিনি দ্যান, দুঃখুও যে তাঁরই দান। তাঁরে ভালবাসলি দুঃখরে ফেলি কেমন করে। আহা, তাঁর দুঃখু বাবু, মাথা পেতে নেলাম। তাঁর দযায় মেয়েটা বেঁচে আছে, বাবু। সামনের বছরডায় তারে বড় ইস্কুলি ভর্তি করাতি হবে। তারে ভাল করে পড়াবার জন্যি এক মাস্টারবাবু ঠিক করিছি। তিনি পড়াচ্ছেন। আশীব্বাদ করবেন মেয়েটা আমার যাতে বড় ইস্কুলে পড়্‌তি পারে, বাবু।

ও জানাল, মেয়েটা তার বড় লক্ষ্মী। কখন কি করা দরকার সব বোঝে। ঘরের অনেক কাজ করে, আবার পড়াশুনাতেও ওর মন আছে। ছেলেটির মত মেধা না থাকলেও চেষ্টা আছে দেখে খগেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। মেয়ের কথা বলতে চোখে জল এসে যায় কখন। রিক্সা থামিয়ে, গামছা দিয়ে জলটা মুছে নেয়।

—গেল সনে এক বর্ষার দুর্যোগে জ্বরে তিনদিন বেহুঁশ, বাবু। ঘরে কিচ্ছু নেই। উপোস করি থাকতি হয়। কল্যাণী বললে—বাবা, আমার কাছে টাকা আছে, মাকে দেব? জমানো পয়সার কোটো খুলে গুন্‌তি বসে গেল, বাবু। ষোলো টাকা তো নয় বাবু, ষোলো আনা পুণ্‌ণ্ করতি মা নক্‌কী এয়েছেন গো, মা নক্‌কী এয়েছেন্। গলা ধরে আসে বলতে বলতে।

আবার চোখের জল মোছে খগেন।

একাদশতম অধ্যায়

শ্যামাকান্ত হারে নি

কথাটা শুনে চম্‌কে উঠলাম—'শ্যামাকান্ত সরকার নেই'। দু'সপ্তাহ আগেই তো বিজয়পুরের রজত-সাহিত্য বাসরের মাসিক অধিবেশনে শুনিয়ে গেলেন 'ফাগুন-আগুন' কবিতা আর 'মসনদ' রূপক নাটিকা। সিরাজদ্দৌলার ব্যর্থতার সুরে বেজেছিল বাংলার প্রতি কী গভীর বেদনা—'দুর্দিনে সর্বস্ব দিয়ে আমি কি বাংলার সেবা করিনি? প্রবল প্রতিরোধ বিশ্বাসঘাতকতায় আমি কি সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিনি? জীবন-যুদ্ধে আজ আমি পরাস্ত—বন্ধুগণ, বড়ই ক্লান্ত আমি।' কথাগুলি এমন মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠবে কল্পনাও করতে পারিনি। শ্যামাকান্তবাবু সুরসিক, সদাহাস্যময়। শীর্ণকায় চেহারায় মুখে কঠোরশ্রমের ছাপটি ছিল সুস্পষ্ট। পরণে প্রায়ই পায়জামা-পাঞ্জাবী—কদাচিৎ প্যান্ট-সার্ট। স্বল্পবাক্— কিন্তু কোটরগত চক্ষুদুটিতে যেন সন্দিগ্ধ এক দৃষ্টি। আলাপে আশ্চর্য এক নির্লিপ্ততা। প্রতি মাসে আজকাল আর আসতে পারেন না। প্রায়ই অসুখে ভোগেন। ভেবেছি খোঁজ নেব—হয়ে ওঠে না স্বভাবের তাড়নায়।

সংসারে বৃদ্ধা মা, বিধবা বোন, এক মেয়ে। ছেলেটি একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্র। মেয়েটি বি. এ. পার্ট ওয়ান বাংলা অনার্স পড়ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পড়বার সময় দেখেছি খুবই মনোযোগী। বাড়ির খোঁজখবর প্রথম দিকে নিতে পারিনি। যখন শুনলাম খুবই কষ্টে চলছে সংসার—নিজেকে অপরাধী মনে হল। কী নিষ্ঠুর আমি। মাসে মাসে পড়াবার জন্য পাঁচ মাস ধরে টাকা নিয়েছি। শর্মিষ্ঠার পড়াশুনার কিছু ভার এরপর তার কাছ থেকে কিয়দংশ আদায় করতে পেরেছি। একটুতেই কৃতজ্ঞতায় তার চোখে নেমেছে জল। ছেলেটির পড়াশুনার খোঁজখবর রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছি ও পড়াশুনায় মনোযোগী—চিন্তা করবেন না।

বছরখানেক আগে তার বাড়িতে গেছি। অনেক খুঁজে দেখা মিলেছে। পল্লীর এক প্রান্তেই তার নিবাস—পাশেই প্রকাণ্ড এক মাঠ। মাটির বারান্দা, বাঁশের বেড়া আর টালির চালের একটা ঘরের মাঝখানে বেড়া বসিয়ে দুটি ঘর করা হয়েছে। বারান্দার একাংশ ঘিরে রান্নাঘর। সংসারের প্রসঙ্গ তুললে দু'একটি ছোট উত্তর দিয়েই গিয়েছেন প্রসঙ্গান্তরে। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার আর শিক্ষার অব্যবস্থার

কথা নিয়ে হয়েছে মত বিনিময়। সুনীলমাধব তাঁর অঞ্চলের বড় ব্যবসায়ী হলেও বেশ হৃদয়বান। শুনেছি শ্যামাকান্তবাবুকে কয়েক বছর হল তিনি একটি সরকারী দোকানের দেখাশুনা ও হিসাবের আংশিক কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বিধবা বোন বাড়িতে কলে সেলাই ও ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে কিছু রোজগার করেন। কষ্টেসৃষ্টে শ্যামাকান্তের সংসার চলত। কিন্তু কারও অসুখ-বিসুখ হলেই অচল হত সংসার। সেবার ওঁর বাড়িতে গিয়েই জানলাম বার দুয়েক এর মধ্যে নিজে ও ছেলেটি গুরুতর অসুস্থ হয়েছিল। তাই সাহিত্যসভায় আসার কোনো সুযোগই তাঁর ছিল না।

মনে পড়ে, বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় সবে বসেছি। এরই মধ্যে বাইরে থেকে বাড়িতে পা দিয়ে একবার আমার দিকে চেয়েই ঘরে এনে বসালেন—'কি সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন।' বললাম—'কেমন আছেন?' প্রশ্ন শুনে একটু হাসার চেষ্টা করে উত্তর দিলেন 'ভাল, আপনার সব কুশল তো?'

একটু আগেই শুনে নিয়েছিলাম শ্যামাকান্ত ও তাঁর ছেলে শুভ্রের অসুখের কথা।

বললাম, 'আপনি কাজ থেকে ফিরলেন, বিশ্রাম নিন। সন্ধ্যাও হয়ে এল। আমি ফিরব এখন।'

শ্যামাকান্তবাবু আপত্তি করে বললেন 'আজ্ঞে, আমার ছুটি ছিল, বসুন। আমাদের এই প্রতিবেশীর অসুখ শুনে তাঁকে একটু দেখে ফিরছি—মদনবাবু খুবই হিতৈষী জন। দুর্দিনে আমাদের পাশে সবসময়ই আছেন। কী বলব! তাঁর ঋণ শোধবার নয়। স্ত্রী সুধার মুখে পরে অভিযোগ শুনেছি—'কি বলব ওর কথা—ছেলেটার জ্বর। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। উনি ছুটলেন মদনদার ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতে।' মদনদার সংসারে অনটন লেগেই আছে। কারখানা 'লক্‌-আউট' হবার পর থেকে বছর দশেক চলছে পৌরোহিত্যের সামান্য আয়ে। অসুস্থ হলে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেটার বয়স বিশ বছর হতে চলল। লেখাপড়ায় মন নেই। পূজা-আচ্চার কাজ শেখাবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। বাইরে আড্ডা আর পার্টির কাজ করে বেড়ায়। পার্টির ঝগড়া-ঝাটিতে দু'একবার তার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে শুনলাম। দুটি মেয়ে ইস্কুলে পড়ে।

লুকিয়ে চল্লিশ টাকা মদনদার স্ত্রীর হাতে দিয়ে শীগ্‌গির ডাক্তারের কাছে যাবার কথা বলে এসেছিলেন শ্যামাকান্ত। কিন্তু ফিরবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যান পথে। একজন প্রতিবেশী প্রায় বাড়ি পর্যন্তই পৌঁছে দিয়ে যায়। শ্যামাকান্তই তাঁকে বাড়ি পর্যন্ত আসতে দেয়নি। এ বৃত্তান্ত শুনে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁকে সাহায্য করার লোক কমই জোটে। অথচ শ্যামাকান্ত এমন কাণ্ড অন্যান্য ক্ষেত্রেও মাঝে-মধ্যে করে থাকেন।

শ্যামাকান্ত নিজের সংসার দেখেন না, পরেব সংসার দেখে বেড়ান—সুধার এ অভিযোগ যে সত্য নয়, তার প্রমাণ পেয়েছি। সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধ করি গত বছর সুধার কঠিন অসুখের সময় পাওয়া গেল। একশ চার ডিগ্রি পর্যন্ত জ্বরে বেহুঁশ সে। শ্যামাকান্ত ডাক্তার ডেকে ওষুধের ব্যবস্থা করেও খুশী থাকেন নি। অভিজ্ঞতর ডাক্তারের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন। নিজে পাশে থেকেছেন একটানা জ্বর না কমা পর্যন্ত। ছেলে-মেয়ের পড়ার ব্যয়ভার কঠিন হলেও সাধ্যমত তা বহন করে এসেছেন। অবশ্য 'টিউটব' সবসময় দিতে পারেন নি।

নিজেকে নিঃশেষ করে যে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে সেকথা বিধাতাপুরুষ ছাড়া দ্বিতীয় কে-ই বা জানবে? শর্মিষ্ঠা মাঝে মাঝে রাগ ক'রে খাবার সময় বলেছে 'খাব না, যাও। নিজে কিছু খাবে না, আমাদের খাওয়াবে?' অনেক বুঝিয়ে শ্যামাকান্তকে মেয়ের অভিমান ঘুচাতে হয়েছে। শরীরের দিকে দৃষ্টি দেবার কথা শ্যামাকান্তকে আমিও বলেছি। আরও কিছু অর্থোপার্জনের কথা তুললে সে বলেছে, 'Oh, no! my best friend'—'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্'। আমি ভাল স্পোর্টসম্যান ছিলাম, আজও আছি। ক্ষেত্রটা শুধু পাল্টেছে। আগে ছিলাম মাঠে, এখন সংসার-ক্ষেত্রে। জানেন তো, ভাল স্পোর্টসম্যানের সবচেয়ে বড় প্রেরণা তার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়। দারিদ্র্য আমাকে দীর্ঘকাল শক্তি জুগিয়ে চলেছে। Oh, my best friend! আমি হারি নি, বন্ধু, আমি অপরাজিত!' নির্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁর চোখের জল আমার চোখেও জল আনে।

দ্বাদশতম অধ্যায়

কানুর কেরামতি

শাস্ত্রে জীবনের কামনা-বাসনাব দাহকে জয় করার কথা বার বার বলা হয়েছে। কেননা, উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি ঘটে না। তাই তাকে নির্জিত করে তবে শান্তি। কিন্তু সেই দাহ যে ছাই হয়ে উঠতে পারে, তা কানুকে না দেখলে বোধ করি হৃদয়ঙ্গম হত না।

কানু অর্থাৎ কানাই ভট্টাচার্য ওর মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেছে। মামার রোজগার সামান্য। তবু তিনি তাঁর বিধবা দিদি ও এক ভাগ্নের খাওয়া-পরা-থাকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিনিময়ে কানুকে রেশন, বাজার, কেরোসিন তোলা প্রায় সব কাজ করতে হয়। কানু উচ্চ মাধ্যমিক পড়ে। এখানে বাংলা পড়তে আসে। দু-সপ্তাহ এল না। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওর মামা সংসারের কাজে কোথায় পাঠিয়েছেন।

মামার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন—'মাস্টারমশায় প্যাট চালানই দায়। ঘরে ঠোঙ্গা বানাই। দু'চার দোকানে অরে পাঠাই বিক্রি করতে। নিজের শরীলডা ভালো না আইজ কয়দিন হৈল।'

আমার মুখ দিয়ে আর কথা বার হল না। শুধু মাথা ঘাড় নেড়েই ফিরে আসি। অবাক হলাম—কানুর কাণ্ড দেখে। ও পড়বার পয়সা যোগায় কোত্থেকে?

পরে জিজ্ঞাসা করলে বলেছে, স্যার, ট্যুইশনি করি, টুকটাক কাজও করি। এতেই চলে যায়। খুবই লজ্জা অনুভব করলাম ওর কথায়। দু-এক জন সহপাঠীর সাহায্যে ওর জন্য বাড়িতে আলাদা করে একটু দুধের ব্যবস্থা করা গেল। বললাম, আমার কিছু কিছু বিশেষ পরিচিত জন আছেন। তাঁদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয় না। তুমিও আজ থেকে আমার বিশেষ পরিচিত জন হলে।

প্রায় একবছর হল এখানে পড়ছে। একদিনের জন্যও "ভালো নেই" বলে নি। অভাব-অভিযোগ তো দূরের কথা। সবসময়ই হাসিমুখে বলেছে 'ভাল আছি, যাবেন একদিন।'

গেছি ওদের মামার বাসায়! পাকা দেওয়াল, টালির চাল, মেঝে মাটির।

পাশাপাশি দু'টি ঘর। একটিতে ওর মেজমামার পরিবারের চারজন, অপরটাতে কানু আর তার মা। ওর ঘরের একপাশে পড়ার টেবিল-চেয়ার। পাশে কাঠের তাকে বই সাজানো। অভ্যর্থনার জন্য কী করবে আর না করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ওকে আশ্বস্ত করে ফিরে আসি।

বি. এ. অনার্স পাশ করে এম. এ. পড়ল, বি. এড-ও পড়ল। উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স, পাস, ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে প্রায় সমস্ত খরচই চালালো আশ্চর্যভাবে। মধ্যে মধ্যে খবর দিয়েছে। নিয়েছে পরামর্শও সদা হাস্যময় কানাই। সব সময়ই ও ভাল থাকে। না, কথাটা ভুল হল। ভাল থাকে, না বলে 'ভাল থাকতে জানে' বলাই ঠিক।

এরই মধ্যে বার তিনেকের খবর বলছি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মাস তিনেক আগে ওর ওখানে গিয়ে শুনি এবার পরীক্ষায় বসবে না, ঠিক করেছে। ওকে দু'বেলা ট্যুইশনি করতে হচ্ছে—মামা অসুস্থ, কাজ করতে পারছেন না। সংসারের খাওয়ার খরচ জোটাতেই ওকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। পরীক্ষার ফি-এর টাকাও জোগাড় করতে পারবে না। তাই এই সিদ্ধান্ত। দিব্যি হাসিমুখেই কথাগুলি বলে আমার কুশল সংবাদের জন্য ব্যস্ত হল। অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হচ্ছে দেখে তাড়া লাগাতে হল। একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললাম, 'এতদিন ধরে পড়িয়েছি। তোমার কাণ্ডজ্ঞান তো কিছুমাত্র জাগল না। কত ব্যাপারেই পরামর্শ নাও—আর এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে আমার পরামর্শ নিলে না! পবীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। একবেলা পড়ানো পরীক্ষা পর্যন্ত বন্ধ রাখ। বাকি সব বন্দোবস্ত হবে।'

অবাক হল। খুশীর ভাব ওর চোখেমুখে। অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিতীয় বিভাগে ভাল মার্ক পেয়েই পাস ক'রে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ল।

দু'এক জন সুহৃদজনের সহায়তায় ওর বই ও প্রাইভেট পড়ার বন্দোবস্ত হল। যথারীতি ট্যুইশনি তখনও দু'বেলাই করে। নির্বিঘ্নে পার্ট ওয়ান বি. এ. পরীক্ষা দিল। আটান্ন শতাংশ মার্ক পেয়েছে। পার্ট টু-র জন্য খুব খাটল। কিন্তু দুবার অসুখে পড়ল।

প্রথমবার বিদ্‌ঘুটে জ্বর চলল বারো দিন। দ্বিতীয়বার বসন্ত রোগে নষ্ট হল সতেরো দিন। জ্বরের খবর পাই নি। বসন্তের খবরটাও ও দেয় নি, নিতে হয়েছে। বলল, 'ভেবেছিলাম সপ্তাখানেকে সেরে উঠব—কিন্তু তা হল না। পরীক্ষা দিতে পারব তো স্যার?'

আমি বললাম, 'কেন পারবে না? এখনও দেড় মাসের বেশী সময় রয়েছে।' অনার্সে সে শতকরা আটান্ন মার্কের কিছু বেশী পেয়েছিল। বি. এ. পার্ট টু অনার্সের

প্রস্তুতির সময় থেকেই কানু স্বাধীনভাবে একটি ঘর ভাড়া করে বাস করছিল। নিজেই রান্না করে খেয়েছে। ওর বিধবা মা থাকেন দাদার সঙ্গে। মাঝে মাঝে ওর বাসায় আসতেন।

অনার্স পাস করে চেষ্টা করেছে অনেক। কোথাও যদি একটা যেমন তেমন কাজও পায়। মেলেনি তেমন কোনো কাজ। যথারীতি ট্যুইশনি করেছে। এবার ছাত্র-ছাত্রী বেশী পেল। ক্রমে এম. এ. পরীক্ষা এগিয়ে এল। আমার পক্ষে গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়ে ওঠে নি। মধ্যে মধ্যে ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে খবর পেয়েছি। কিন্তু পরীক্ষার ছ'মাস আগে থেকেই যোগাযোগ একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, যেজন্য ওর পরীক্ষার খবরটাও জানতে পারি নি। অনেক পরে একদিন ও দেখা করতে এল। পরীক্ষা ভাল দিয়েছে বলল। কিন্তু সংসারে এর মধ্যেও কিছু বিপর্যয় ঘটে গেছে— সেকথা বলে নি।

মামার ছেলেটির কঠিন অসুখ হলে ওকে তা সামাল দিতে হয়। লুকিয়ে নিজের হাতঘড়ি আর বি. এ.-র কিছু বই বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করেছে। ওর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে এসব খবর জানতে পারি।

একটু স্তম্ভিতই করল ছেলেটি। এই বয়সে এই স্থৈর্য আর নীরবে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি কোথা থেকে পেল? মনে হল—পিতৃহারা কানাই শৈশব থেকেই একের পর এক আঘাতের মোকাবিলা করেই পেয়েছে এই শক্তি। মনে মনে প্রার্থনা করি ওর একটা চাকরী হোক। নিজের প্রার্থনায় মনে মনে সেদিন হেসেছিলাম। দু'চার বছর তো কমপক্ষে লাগবে এ প্রার্থনা পূর্ণ হতে— চারদিকে যা দেখছি তাতে বুঝেছি আশু এ ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিন মাসের মধ্যে ও এসে প্রণাম করে বলল, 'কেমন আছেন স্যার? ভাল তো?' বললাম, 'তুমি ভাল তো?'

কানু হেসে মাথা নেড়ে বরাবরের মত বলল, 'ভাল'। একটা সুখবর আছে স্যার। চাকরী পেয়েছি—কলকাতার একটা স্কুলে।

আনন্দ আর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম সেদিন। মন গেয়ে উঠল 'এ কী করুণা, করুণাময় হে।'

ত্রয়োদশতম অধ্যায়

রাজার দুলাল

'নেকাপড়া শিখ্ছে, নেকাপড়া! সব জজ ম্যাজিস্টর হবে। গরীবির ঘরে এ্যাত নেকাপড়ায় কি হবে কন্ দিনি, বাবু?' —ক্রুদ্ধস্বরেই কথাগুলো বললেন দুলালের বাবা অক্ষয় পাল।

দোলতলার সুভাষপল্লীর শেষপ্রান্তে দুলালদের বাড়ি। টালির চাল, মাটি আর বেড়ার তৈরী ঘর। এক ভাই আর এক বোন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিনই যেতে পারে না স্কুলে। বাবার কাজে সাহায্য করতে হয়। নারকেলের ছোবড়া তৈরী ও সংগ্রহ করে তা দিয়ে পালঙ্কের আব চেয়ারের গদি তৈরী হয় ওদের বাড়িতে। প্রায় পনেবো বছর ধরেই দুলালের বাবা এ কাজ করছেন। পাশের বাড়ির সীমন্তীদি না থাকলে ওদের লেখাপড়া আদৌ হত কিনা সন্দেহ। তিনি দুলালকে উৎসাহ দিয়েছেন বরাবর। এবার সে উচ্চ মাধ্যমিক দেবে বাণিজ্য শাখায়।

স্কুলে প্রায় নিয়মিতই আসছিল দুলাল। দু'সপ্তাহ পার হল আসেনি স্কুলে। খোঁজ নিতে ওর বাড়িতে এসে দেখি ওর বাবা ওকে বকাবকি করছেন। আমাকে পেয়ে অক্ষয় যেন আরও উৎসাহ পেলেন।

'আচ্ছা, বলুন তো মাস্টারবাবু, ও চারডে পাস করে করবেডা কী? চাকরি পাবে? তার চেয়ে আমার সঙ্গে কাজডা ভাল করে শিখলি কাজ দিত না? বেশি বুঝতি শিখিছে। কী শেখাবেন কন্?'

অনর্গল বকে চলেছেন অক্ষয়। মাথা নেড়ে কিছুটা সম্মতি জানিয়ে ওকে তখনকার মতো আশ্বস্ত করলাম। এ অবস্থায় ওর বাবাকে কি করে বোঝাই, পড়াশুনার দাম অনেক। দুলালকে পড়াশুনায় এতদিন উৎসাহ দিয়ে এসেছি। ওর অসুবিধাগুলি সাধ্যমতো দু একজনের চেষ্টায় অনেকটা দূর হয়েছে। উৎসাহ নিয়েই পড়াশুনা করছিল। বাবা অসুস্থ হওয়ায় অর্ডারি কাজগুলি ঠিকমতো দেবার ব্যবস্থা করতেই ওকে কদিন স্কুল বন্ধ করতে হয়েছে।

স্কুলের সময় হয়ে গেছে। চলে আসছি, এমন সময় দুলালের মা বাইরে থেকে এসে পড়লেন আমাদের সামনে। উল্টো অভিযোগ শুনতে হল—'ক্ষ্যামতা নাই

এক ফোঁটা, ওদিকে বক্তিমে ঝাড়ছে। আমি কত কষ্ট কর্যে ছেইল্যে মেয়েদের ইস্কুল পাঠাচ্ছি। দুলাল আপনারগো আশীব্বাদে এট্টা পাস কর্যেছে! এইবার দুড়ো করবে।' কথা বলতে বলতে ওর মার চোখে জল এল। বলল, 'কত কষ্টের পয়সা। সব নেশা কর্যে শেষ কর্যে দিল বাবু, কি কব ঘরের কথা! মনের দুঃখে সব বলি।'

মনে পড়ল আমার পরিচিত এক বাড়ি থেকেই শুনেছিলাম দুলালের বাপের মদের নেশা আছে। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ির কথা জানতাম না। আশ্চর্যের ব্যাপার। দুলাল মাঝে মাঝে আসে। স্কুলে প্রায়ই দেখা হয়। সব সময় হাসিমুখ। পড়াশুনা সংক্রান্ত কথাই বলে। 'কেমন আছ? কেমন চলছে?' জিজ্ঞাসা করলে হেসে ঘাড় নেড়ে বলে 'ভাল'।

আজ ভাবি কত 'ভাল'র চেহারাই দেখলাম। ভালর মাপকাঠিটা এখনও খুঁজে পাইনি। কোনোদিন পাব কিনা জানি না। দুটো বই শুধু ওকে দিতে পেরেছি। পরীক্ষা শেষ হবার পর বই দু'টি ফেরৎ দিয়ে প্রণাম করে গেল। বার বার বলতে লাগল, বই দুটো পেয়ে ও অনেক উপকৃত হয়েছে। সঙ্গে এনেছিল ওদের গাছের দুটি বড় পাকা পেঁপে। বলল, 'গাছের পেঁপে, মা পাঠিয়ে দিলেন—খাবেন।'

ওদের সংসারের কথা ভাবি। ঘরেতে নিত্য অভাব। তার উপর ওর বাবার ওই নেশাগ্রস্ততা। এর ভিতর ও কিন্তু ঠিক পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। ভালো আছে। কত ভাল আছে বুঝতে পারছি। মনে মনে বলি 'ভাল থাকার সংজ্ঞাটা বলতে পার, ভাই?'

গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ওর খোঁজে যাই ওদের বাড়িতে। তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। শুনলাম ও কোথায় যেন পড়াতে গেছে। অন্যত্র কিছুক্ষণ পরিক্রমা করে এসে ওর দেখা পেলাম। দুলাল বলল—'তিনটি ট্যুইশনি করি, স্যার। বোনের জন্য একজন পড়াবার শিক্ষক ঠিক করেছি। তাকে দিতে হয় সত্তর টাকা। বাড়িতেও শ'খানেক দিই।'

অবাক হলাম ওর এই কর্তব্যবোধে। ওর বাবার শরীর প্রায়ই খারাপ থাকে, রোজগারও তাই তেমন আগের মতো নয়। সংসারের অর্ধেকটাই ও সামলায়। বি. কম্. অনার্সে ভর্তি হয়েছে। দু'জন শিক্ষকের কাছে পড়তে যায়। পড়াশুনায় ওর আগ্রহ দেখে দু'জনই ওকে অর্ধবেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। ভাল লাগল—যখন ওদের বাড়িটা খুঁজে বার করতে গেছি, পাড়ার ছোট বড় সকলেই ওকে এক ডাকেই চিনল। আগ্রহ ভরে বাড়ির পথটাও দেখিয়ে দিল। ওদের বাসার ঠিক আগের মুদিখানার যুবক তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলল, কোন্‌খানে নেই ও। জলে ডুবেছে কেউ, সবার আগে ও-ই যায় এগিয়ে। কারো মারাত্মক অসুখ। ছুটে ও-ই আগে

আনবে ডাক্তার, তারপর ওষুধপথ্য। অফিস থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে কারও। দুলাল শোনামাত্রই ছুটে যাবে, সন্ধানও ঠিক একটা এনে দেবে।

অল্পদিনের কথা। একটু দূরেই এক বৃদ্ধা মারা গেলেন। তার কাছে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া থাকতেন। আর কেউ নেই, খুবই দরিদ্র। মৃত্যু-সংবাদ শুনে ও ক'জনকে ডেকে নিয়ে টাকা তুলতে বের হল। দু'ঘণ্টার মধ্যেই সৎকারের সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাঁশ, দড়ি এল, চালি তৈরী হল। নতুন কাপড় থেকে শুরু করে শ্মশানের সব জিনিসই এসেছে—শুনলেই হল! কেন, কি, কোথায়— কোন প্রশ্নই কেউ এ পাড়ায় করার প্রয়োজন বোধ করে না। কত দিতে হবে শুনে নিয়ে, কখনও বা শ্মশানেই প্রয়োজনমতো টাকা সবাই দেয়। সেদিনও দিল।

যুবক বন্ধু আরো বললেন, ওর সঙ্গে যারা শ্মশানে যায় তারা ওকে রীতিমত মানে, ভয়ও পায়। কোনরকম নেশা পর্যন্ত কেউ করে না, করতে সাহসও পায় না। একটি পয়সা অপব্যয় হবার উপায় নেই। যা বাঁচবে, মৃতব্যক্তির গৃহেই দিয়ে যায়। সেদিনও দেড়শ টাকা ওই বাড়িতে ধরে দিয়ে এল।'

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম দুলালের কথা। এ কোন দুলাল? দুঃখীর না রাজার? অসহায়, দুঃখীর পাশে থাকাটাই ওর স্বভাব। সব কাজেই ডাকামাত্র ওকে পাওয়া যায়। সবার আপন, তবু দুঃখীরই ও যেন পরম ধন, একান্ত আপন। 'সময় কারো যে নাই।' দশটা মিনিটও আজ কেউ যেখানে অপরের জন্য ব্যয় করতে চায় না, সেখানে ও নিজেব সব কাজ ফেলে ছুটে আসে। একে কোন্ অভিধায় ডাকব আজ?

ও তো রাজা। সবাই ওকে সব কাজের নেতৃত্ব সমর্পণ করে বসে আছে। ও যা দাবি করবে, সবাই তা সাধ্যমত মেটাবেই। সবাই জানে মহৎ কাজেই ওর যা কিছু দাবি। তাই সবার ও রাজা। সবার দুলাল— রাজার দুলাল। রাজার দুলাল যে পথ দিয়ে যায় আজো বুঝি সেই পথে তাকে একটিবার দেখে নিতে চায় মন। নিজেকে এমনি করে দিতে শিখেছে যে, সে-ই তো জানে পথের সন্ধান—ভালো থাকার মহামন্ত্র।

রাতের অন্ধকারে, জ্যোৎস্নায় অবকাশে ও বাঁশী বাজায়। 'ঘর-ছাড়ান আকুল' সে সুর 'উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে' কোন্ সুদূরে!

চতুর্দশতম অধ্যায়

দুঃখের তিমিরে

সোনারপুরের পরিমল ঘোষ শুনেছেন, জেনেছেন—'আমার বলে কিছু নেই। এ জগতের সব কিছুরই কর্তা একজন— সেই সর্বনিয়ন্তা ভগবান,' তাই একটু অবাক হলাম এমন মানুষকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে। অবশ্য আঘাতটি মর্মান্তিক— একমাত্র পুত্রসন্তানের কঠিন রোগভোগের পর মৃত্যুতে নিজেকে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছেন না পরিমলবাবু। আমাকে দেখে আবেগে উচ্ছ্বসিত হযে কান্নায ভেঙে পড়লেন। গৌহাটিতে একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরী



পেয়েছিল সমীরণ। ওখানেই অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য আসে বাড়িতে। সামান্য রক্তাল্পতা শেষ পর্যন্ত ব্লাড্ ক্যান্সার-এ দাঁড়াবে, কেউই ভাবতে পারেন নি। চিকিৎসার জন্য বিপুল ব্যয় করেও রক্ষা হল না। মধ্যে দু'মাস আগে গিয়ে শুনলাম 'একটু ভাল'। ভেবেছিলাম এ যাত্রা বুঝি রক্ষা হল। এর সাতদিন পর থেকেই হঠাৎ অবস্থা খারাপ দিকে যায়। দক্ষিণ কলকাতায় কোন্ এক নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছিল।

অনেক রক্ত দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফল হল না। প্রায় চারমাসের মাথায় সমীরণ ছেড়ে গেল সবাইকে। ডাক্তার, নার্স প্রত্যেকেই অবাক হয়েছে ওর প্রাণশক্তি দেখে। এত সংগ্রাম-শক্তি এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না। ওকে সবাই ভালবাসত ওর ব্যবহারের জন্য। মৃত্যুর দশ দিন আগেও ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনিয়েছে—

আমি যাব যেথা তব তরী রয়/ওগো মরণ, হে মোর মরণ—
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়/করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়/দূর ঈশানের কোণে আকাশে
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়/তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—/আমি করিব নীরবে তরণ—

পরিমলবাবু শ্রীমদ্ভগবদগীতা আর 'কথামৃত' পাঠ করতেন নিয়মিত। আমাদের সঙ্গে আলোচনাও হত। প্রায়ই বলতেন এ বছরটা গেলেই ব্যাঙ্কের চাকরী থেকে অবসর নিচ্ছি। ছেলের রোজগার চাই না। পেনসনের টাকাতেই আমাদের দু'জনের চলে যাবে। ও নিজে দাঁড়াক। আপনাদের আশীর্বাদে ভালই কাজ করছে নামী কোম্পানীতে। তাঁর ইচ্ছায় যেমনই থাকুক আমি চিন্তা করি না। আমি ভাববার কে? তাঁর সন্তান তিনি দেখবেন।

তিনি যা দেন তাই-ই শুভ বলে মেনে নিয়েছেন যিনি, সেই পরিমল বাবুর কান্না থামান কঠিন হল। স্ত্রীর অবস্থাও ভালো নয়—হার্টের অসুখ তাঁর। এক কন্যা তাঁকে সামলানোর চেষ্টা করছেন। অপর কন্যা জব্বলপুর থেকে এখনও এসে পৌঁছন নি।

পরিমলবাবুর একমাত্র ভ্রাতা সুধীরচন্দ্র থাকে বেলঘরিয়াতে। বছরখানেক আগে সোনারপুরের পৈতৃক নিবাসে এসে খুব হামলা করে গেছে। বাড়িজমির অংশ চায়। শুনেছি শান্ত পরিমলবাবু শুধু বলেছেন 'বেশ তো এখানে এসে থাক না—ভাগাভাগির কি আছে? আমার অবর্তমানে তোমাকেই সব দেখতে হবে।

এ কথায় সুধীরের মন ভরে নি। সে নাকি অনেক অকথা কুকথা শুনিয়ে গেছে। শীগ্‌গিরই আবার আসবে বলে গেছে। দরকার হলে মামলা-মোকদ্দমাতেও যাবে। অনেক অপমান সইতে হয়েছে তাঁকে সেদিন। পাড়ার লোককে এসে শেষ পর্যন্ত সামলাতে হয়েছে। এই ঘটনার সাত আট দিন বাদে গিয়ে 'কেমন আছ, শুধালে সেই শান্ত মৃদু হাসিতে উত্তর মিলল 'বেশ আছি, তোমরা ভাল ত?'

মাসের মধ্যে অন্তত দু'বার খবর না পেলে বেলঘরিয়ায় ভাইয়ের বাড়িতে তাঁর আসা চাই। সুধীরের কন্যা সপ্তম ও পুত্র পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ওদের খবর নিয়ে ফেরেন। সুধীর দু'তিন মাস অন্তর সোনারপুরের বাড়িতে যায় মাকে দেখতে। দশ বছর হল বাবা এখানেই দেহত্যাগ করেছেন। এর দু'বছর পরই সুধীর ঝগড়া-

ঝাটির শেষে আলাদা বাড়ি করে বেলঘরিয়ায় চলে আসে। প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরী। সুখেই আছে। কিন্তু সম্পত্তির ভাগের জন্য সে হয়ে উঠেছে মরিয়া।

একটু আশ্বস্ত হয়ে পরিমলবাবু বললেন, 'ওর কাকা শেষের বিশ দিন সবাইকে সামলেছে। রাতের পর রাত জেগেছে, নিজে রক্তও দিয়েছে। কিন্তু সব বৃথা। সবাইকে ও চিরছুটি দিয়ে গেল।'

এই ঘটনার মাস দুয়েক বাদে সোনারপুরে গিয়ে শুনি উকিলের চিঠির কথা। সুধীরচন্দ্র মিথ্যা মামলা ফেঁদেছে। এখবর সে নিজে কিছুই আমাকে বলে নি। 'কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করতেই স্মিত হাসিতে সেই একই উত্তর। অন্যান্য গল্প স্বাভাবিকভাবেই করে গেল। ভাইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করতেই মৃদু ক্ষোভের সঙ্গে জানাল, 'সবচেয়ে দুঃখের কথা সুধীরটা আমার উপর আস্থা রাখতে পারল না।' শেষ পর্যন্ত কোর্টে গেল। পরিমল কি ব্যবস্থা নিয়েছে জানতে চাইলে সে বলল, 'করুক সে মামলা একা। আমি ওর মধ্যে যাচ্ছি না। সব নিয়ে নিক না। তাড়িয়ে দেবে দিক।' আমি শুনেই স্তম্ভিত। বললাম, 'না এ হতে পারে না। আমি ব্যবস্থা করছি উকিলের। এতবড় অন্যায় তুমি মুখ বুজে সইবে? অন্তত ওকে একটু সম্‌ঝে দেওয়া দরকার।'

নির্বিকার পরিমলের চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। নীরবে কিছুক্ষণ কাটল। সেদিনের মত বিদায় নিলাম।

তিনদিনের মাথায় জরুরী বার্তা এল। ভয়ঙ্কর অসুস্থ পরিমল। বেলা দশটা। তক্ষুনি ছুটলাম। গিয়ে শুনি সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্, তবে অল্প মাত্রায়। নার্সিং হোমে দেবার কথা বলেছেন ডাক্তার। কিন্তু পরিমল যেতে চাইছে না। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম—বাড়িতে এর চিকিৎসা নিরাপদ নয়, আপত্তি কেন—দ্রুত সেরে উঠবে, তুমি যাও।

ও আমার মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইল। বিছানার নীচে থেকে তিন লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হাতে দিল নিরাপদে রাখবার জন্য। নোমিনি হিসেবে ওর ভ্রাতৃষ্পুত্রী সুমনার নাম রয়েছে। কথা বলা নিষেধ। আকারে ইঙ্গিতে বুঝলাম সব। সন্ধ্যার একটু আগে দেখি কাঁদতে কাঁদতে ছেলে-মেয়ে-বৌ সব নিয়েই সুধীর হাজির। দাদার পাশে এসে বসল। ছেলেমেয়ে দু'টির চোখে জল। ওরা জ্যেঠু বলে মাথার কাছে গিয়ে বসল। আশ্চর্যের ব্যাপার। পরিমল নিজেই উঠে বসেছে। দু'একটা কথাও বলছে। ডাক্তারবাবু আর একবার পরীক্ষা করে গেলেন। তার হাসিমুখের দিকে তাকাবার আগেই সে বলে উঠল' 'হতভাগাটা এসেছে। আমি সেরে উঠেছি।'

আমার দিকে চেয়ে বলল—পারো তো সুধীরের বাড়িটা তোমরা বিক্রির ব্যবস্থা কর। আসন্ন সন্ধ্যায় সেদিনের বিষণ্ণ যবনিকা-জাল ছিন্ন হল। সন্ধ্যাতারার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে সকলের সঙ্গে অনুভব করলাম দুঃখের তিমিরে মঙ্গলালোক জ্বলে।

পঞ্চদশতম অধ্যায়

শেষ কোথায়?

ব্রজমোহন দাস অর্ধেকটা দাঁড়িয়ে পড়ে পঞ্চানন মণ্ডলের কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন— এ হতে পারে না। শুধু হতে পারে না নয়, হতে দেওয়া যায় না। দশ-বারো বছর ধরে বিপুল অর্থব্যয়ে অনেক বাধা অতিক্রম করে দুই ছেলে মানুষ করলেন। আর দু'জনেই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বাংলা ছেড়ে বোম্বে আর সিঙ্গাপুর গিয়ে চাকরী করবে! যত বড় পদ আর যত বিপুল অর্থই থাকুক, একজন কি একটু কম টাকায় কলকাতার কাছাকাছি চাকরী জোটাতে পারে না। মেধার দিক দিয়ে তো এরা দু'জনেই হীরের টুকরো। তবে খুশিমত একটা চাকরী কাছে কেন পাবে না? নব বারাকপুর রেল স্টেশনের পাশের ত্রিকোণ পার্কে কিছু বয়স্কের বৈঠক বসে। সেদিনের বৈঠকে 'পঞ্চাননের বাড়ি শূন্য' মন্তব্য শুনেই ব্রজমোহন লাফিয়ে উঠে কথাগুলি বললেন। পঞ্চানন বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ছেলেদের মানুষ করবার পর তারা তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে যদি দূরে যেতে চায় সেখানে আমি বাধা দিলে তা স্বার্থপরতা হবে। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তাদের বিবেচনার বিষয়। প্রত্যেকে নিজের ভবিষ্যৎ দেখবেই।

'না, এইখানে তোমার মত মানি না ভায়া। নিজের ভবিষ্যৎ দেখবে ব্যাপারটা অত সস্তা করে দিলে চলে না। পরিকল্পনা ঠিক থাকলে ভবিষ্যৎ এখানে আরো ভাল করে গড়া সম্ভব'—আপন-যুক্তিতে অটল রইলেন পঞ্চানন।

অমিতাভ কিছুটা চেষ্টা করেছিল কলকাতায় থাকবার। শেষ পর্যন্ত একটা নামী কোম্পানীতে কাজ পেয়েই দিল্লি যেতে হল। সুধন্যর সিঙ্গাপুর যাওয়ার পিছনে অনেকটা বড় অঙ্কের অর্থের হাতছানি ছিল বলেই মনে হয়। ছ'মাসের মধ্যেই পঞ্চানন দুই পুত্রের বিয়ে দিয়েছেন।

সারাদিন পূজাপাঠ আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে অবসরপ্রাপ্ত জীবন ভালোই কেটে যাচ্ছিল। মাঝে হঠাৎ কঠিন অসুখটাই বাদ সাধল। চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য ছেলেরা এসে ব্যবস্থা করেছিল। পঞ্চানন সেরেও উঠেছেন। কিন্তু স্বস্তি নেই একটুও। সহধর্মিণী অমিতার তো সপ্তাহের অর্ধেকদিন কাটে মঠ-মিশনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। সংসারের বাইরের কাজের লোক থাকলেও রান্নার কাজে সাহায্যের লোক নেই। রান্নার লোক রাখার পক্ষপাতী নয় অমিতা একেবারেই। পালা করে দু'জনে অসুস্থ হলে সংসারটা খুঁড়িয়ে চলে। কিছু করার থাকে না। সাময়িক সাহায্য করার মতও উপযুক্ত আত্মীয়-স্বজন তেমন কেউ নেই এখানে।

পঞ্চানন ভাল আছে, কেননা তাকে ভাল থাকতে বলে দিয়েছে দুইপুত্র পুত্রবধূ। নিয়মিত খবর নেয় যতদূরেই তারা থাকুক। 'কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করলে সে ছেলেদের চাকরীর উন্নতির খবর—ওদের সংসারের সুবিধা-অসুবিধার কথা সব বলতে আরম্ভ করে। থামতেই চায় না। সব আদ্যোপান্ত বলা শেষ হলে থামে। ওদিকে বাড়িতে গিয়ে শুনি প্রায়ই ওর শরীর খারাপ হওয়ার কথা। সে দিন বিকেলে রাস্তায় দেখা হতেই বাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। একথা-সেকথাব পর অমিতাভর জন্য দিল্লিতে রান্নার লোক দেবার অনুরোধও করলেন। ওদিকে পুত্রবধূর ঘরের



কাজের একজন মহিলার প্রয়োজনের কথা জানালেন। এখান থেকে একজনকে জোগাড় করে দেবার অনুরোধ করলেন। এ-দিকে পুত্রবধূর সংগীতচর্চার খুব অসুবিধা হয়েছে। প্রতিবেশী বাঙালি খুঁজে পাওয়া কঠিন। সারাদিন ঘরে বন্দী থেকে সংগীত-চর্চায় উৎসাহ রাখা কষ্টকর। অনুষ্ঠান করবার বা অনুষ্ঠানে গাইবার সুযোগ প্রয়োজন। এ সমস্যারও সমাধান চাইলেন। কিন্তু প্রৌঢ় রামতারণ যে এভাবে তেড়ে আসবেন তা ভাবতে পারি নি। রামতারণ ভট্টাচার্য ভাষা-সাহিত্যের এতদঞ্চলের আদর্শ প্রাক্তন শিক্ষক। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, উদার, অমায়িক। তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য আসেন সাধারণ থেকে বিদগ্ধ সর্বস্তরের অনেক মানুষ। পঞ্চাননের পরিবারের ছেলেমেয়েরা সকলেই তাঁর কাছে পড়েছে। সকলেই ওঁর ভক্ত—গুরু বলেই মানে। অসুখের পর চিকিৎসান্তে ছেলেরা চলে যাওয়ায় ফাঁকা বাড়ির কথাটা বলতেই জ্বলে উঠলেন রামতারণ—'হবে না? আদর করে বিয়ে দিচ্ছেন। আর ছেলেরা বৌ নিয়ে উঠছেন হিল্লি-দিল্লি। বুড়ো বাপ-মা মরুক পড়ে। এর নাম লেখাপড়া? ইঞ্জিনিয়ার হইছেন—বেয়াদব, বেল্লিক, বেইমান ছাড়া কি কব এদের? খেটে-খুটে মানুষ করল মা-বাপ

আর গুণধর ছেলে সব ডানা কাটা পরী নিয়ে পাড়ি দেলেন সাগর পার। যত সব অপগণ্ড।

এ কথায় হাসব না কাঁদব, ভেবে পাই না। যাঁরা সেদিন ছিলেন তাঁর পাশে তাঁরা কিন্তু সবাই জোর হেসেছিলেন।

যাঁরা বলবেন যুগ পাল্টেছে, এখন এসব বললে চলবে কেন—তাঁদের উদ্দেশ্যে বলা চলে যুগের পরিবর্তনে জীবনযাত্রার চালচলনের কিছু পরিবর্তন হয়ত অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অনেক অনাবশ্যক পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা নিত্য আমাদের প্রয়োজনটাকে বাড়িয়ে তুলছি না কি? একটি ঘরে যে আসবাবপত্র ত্রিশবছর আগে থাকত, এখন তার সঙ্গে অনেক কিছু যুক্ত হচ্ছে, যা না থাকলেও জীবনযাত্রার কোনও অসুবিধা হত না। মুস্কিল হচ্ছে, কেউ বলবেন আপনি যাকে অনাবশ্যক বলছেন, আমার কাছে তা শুধু আবশ্যক নয়, জরুরি। ফলে এ তর্কের মীমাংসা হওয়া কঠিন। তবে এটুকু স্বচ্ছন্দে বলা চলে আমরা জীবনযাত্রার মান দিনে দিনে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছি। আর সেইসঙ্গে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তফাৎটাকেও আকাশ-ছোঁয়া করে তুলছি।

এই সেদিন বারান্দার একটা টালির চাল মেরামতের জন্য নেপালকে ডাকতে গেছি। তালবান্দার কাছে শহরপুরে থাকে। বেড়ার ঘর, টালির চাল মেঝে পর্যন্ত পাকা। রান্নাঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটা মাত্র ঘর। আসবাব বলতে একটা খাট, আল্না, একটা টেবিল আর নড়বড়ে আলমারিটা। ছোট একটা রেডিও কিনেছে, গান শোনে। ছেলেটি ষষ্ঠ ও মেয়েটি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। ওদের প্রয়োজন মোটামুটি এর মধ্যেই মেটে! টি. ভি. দেখার খুব ইচ্ছা হলে পাশের বাড়িতে যায়। সুখে-স্বস্তিতে আছে। ভাবছিলাম, এর পাশাপাশি আমরা একটার পর একটা প্রয়োজন বাড়িয়ে তুলেও স্বস্তিতে নেই। চাওয়া-পাওয়ার জীবনে চাওয়ার শেষ নেই। প্রাপ্তি সে তুলনায় কম। তাই দ্বন্দ্ব, হানাহানি অবিরাম। যে চাওয়া আরো চাওয়া জাগায়, তার শেষ কোথায়? তাই ভক্ত-কবির কণ্ঠে আকূতি—'এরা চাহিতে জানে না দয়াময়/চাহে ধনজন আয়ু আরোগ্য বিজয়।' আমরা যা চাই, তার পরিণতি ছাই। আমাদের প্রিয়বস্তুগুলি মোহময়, তা সে বস্তুই হোক আর মানুষই হোক। দু'দিনের মোহ ভেঙে তা চুরমার হয়। তখন যে তৃষ্ণা জাগে, সংসারের নিত্যকার এই ধুলোকাদায় পড়ে মাকে ডাকতে পারলে অবশ্যই তিনি কোলে তুলে নেন। কিন্তু ডাকাটাই তো ঠিকমত হয় না। তাই মায়ের দেখাও মেলে না। কপটতা দূরে ফেলে শিশুর মতো সরল হবার কথা বলেছেন সাধু-মহাজনবর্গ। বেদনা দিয়ে 'পরম তিনি' আমাদের চেতনা দান করেন— একথা বুঝি না বলেই বেদনায় আমরা ভেঙে পড়ি, তাঁকে পাওয়াও হয় না।

ষোড়শতম অধ্যায়

অকিঞ্চনের বৈঠকে

"মাস্টার মশয়, এই যে—খুব ব্যস্ত?" মাথা নুইয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলেন "পাঁচ মিনিট একটু বহেন।" ঠিক এই ভয়েই দ্রুত পদে পার হবার চেষ্টা করেও ধরা পড়তে হল। পাঁচ মিনিট যে ত্রিশ মিনিট বা এক ঘণ্টা হবে তা জানি। কলকাতার শহরতলীর এক উপনিবেশ শিবরামপুর। স্টেশন থেকে দু মিনিটের পথ অকিঞ্চন দত্তের বাসভবন। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। ব্যবসার কাজে বাংলার বাইরে বেশ কিছুকাল ঘুরেছেন। অনেক পরিশ্রম করে সংসারের তিন পুত্র ও দুই কন্যাকে মানুষ করেছেন—দিয়েছেন সেই সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষাও। মেয়েদের বিবাহ সুসম্পন্নও হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে পাঁচ বছর সরকারী চাকরীতে কর্মরত অবস্থায় চিকিৎসা-বিভ্রাটে প্রাণ হারায় মধ্যম পুত্র। বিবাহের সাত বছর পর দুর্ঘটনায় এক কন্যার বাঁ-পাটি প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। কোনও মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে তার সংসার। জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি সরকারী হাসপাতালে কর্মরত। কনিষ্ঠ বাড়ির সংলগ্ন গার্হস্থ্য ও শিল্পদ্রব্যের এক সুদৃশ্য বিপণী গড়ে তুলেছে—'ভারতী ভাণ্ডার' ভালই চলছে।



অকিঞ্চনবাবু 'ভারতী ভাণ্ডার'-এর পাশের বারান্দার এককোণের খাঁটটিতেই প্রায় সারাদিন কাটান বলা চলে। স্নানাহার, সামান্য গৃহকর্ম ব্যতীত বাজার-মুখো বড় রাস্তাটির পাশের ঐ স্থানটি তাঁর বড় প্রিয়। মানুষ ভালবাসেন। সর্বস্তরের মানুষ তাঁর প্রিয়। পথ দিয়ে চলা বিভিন্ন মানুষকে তিনি ডেকে পাশে বসান, কথা বলেন।

তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু বিচিত্র ও ব্যাপক। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয় থেকে শুরু ক'রে সাহিত্য, রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা, আন্তর্জাতিক সংবাদের উপর তাঁর চিন্তাধারা ইত্যাদি প্রতি বিষয়েই মত-বিনিময় করেন। কখনও বা একটানা নিজেই বলে যান কথা। আশ্চর্য তাঁর বিষয়ে প্রবেশ-ক্ষমতা। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই যেন সব কথা বলেন। সাহিত্যে তাঁর বেশ অনুরাগ লক্ষ্য করেছি। পড়েছেনও বেশকিছু বই। স্থানীয় পাঠাগার থেকে বই নিয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন চলে। সভা সমিতিতেও তাঁকে প্রায়ই দেখি।

'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করতেই ইঙ্গিতে কুশল জানিয়ে দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন—'দ্যাশ দ্যাখ্‌তে গেছিলেন শুনলাম, আসাম বুঝি? গেছি বারকয়েক। দেখি নাই কিছু। সময় পাইলাম কৈ? ব্যবসার কাজেই যাওয়া। অখন এইখানে বইয়া দ্যাশ দেহি''। বললেন, গতকাল ড্রেন পরিষ্কার করতে এসেছিল যে ছেলেটি তার গল্প। দু'বেলা সব দিন আহার জোটে না। ঘর ভাঙা-চোরা। সারাবার ক্ষমতা নেই। মা, ভাই-এর সঙ্গে রয়েছে পরিবারে নিজের স্ত্রী ও দুই পুত্র। অকিঞ্চনবাবু বলেন 'ছেইল্যাডা দেহি অনেকক্ষণ বৈয়া রাস্তার পাশে। ডাইক্যা আনি বারিন্দায়। কইলাম, 'বহ, চা খাও।' ছেলেটি কেঁদে ফেলে। প্রথমে উপরে উঠতে চায় নি। অনেক বলার পর বারান্দায় এসে বসে। এর নাম রামু—রামপ্রসাদ গুঁই। চতুর্থ শ্রেণী থেকে পাস করে পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার সময়ে বাপ মরে গেল একরকম বিনা চিকিৎসাতেই, আর পড়া হল না ইস্কুলে। জঙ্গল সাফাইয়ের কাজে নামল। ওর সঙ্গে কথা বলে অকিঞ্চন বুঝেছেন পড়াশুনায় একদিন ওর খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। রামু যেভাবে হোক ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবেই। ওদের এসব কাজে আর লাগাবে না। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ও সংসারের সব দায় মেটায়। বড় ছেলেটি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। ছোটটি সামনের বছর ইস্কুলে যাবে। ওর কথা বলতে বলতে অকিঞ্চনবাবুর চোখে জল নামে। কোনও মতে সামলে নিয়ে আমার হাত দুটি ধ'রে বলেন 'বোধ হয় দেরী কইর‍্যা দিলাম...।' 'না, না খুব একটা জরুরী কিছু কাজ নেই' বলতে বলতে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিই।

দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলা থেকে এ বঙ্গে এসে সংসার-তাড়নার জন্যই বি. এ. পড়া বন্ধ করতে হল। মনে হয়, তাই কারও পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখতে তাঁর কষ্ট হয়। দু-তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে তাঁর কাছে পড়তে আসে। ইংরেজী,

অঙ্ক, বাংলা বুঝিয়ে দেন বিনা পারিশ্রমিকেই। গৃহশিক্ষক রাখার ক্ষমতা যাঁদের নেই, তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই আসে তাঁর কাছে। একদিনের কথা মনে পড়ে— একটি নবম শ্রেণীর ছাত্রকে সঙ্গে করে এনে করজোড়ে বললেন, 'আমাব একখান নিবেদন আছিল—এই ছেইল্যাডারে এট্টু মানুষ করেন, পয়সাকড়ি কিছু দিতে পারব না।'

একদিন দেখি মহাভারতের কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে এযুগের প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ চলছে তিনজন প্রবীণের সঙ্গে। একটু তাকাতেই হাত বাড়িয়ে আহ্বান করলেন, 'এই যে মাস্টার, বহেন। কথাডা হইল বিদুর কতখানি তাঁর আদর্শ বজায় রাইখ্‌তে পারছেন।' এমন কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য একটু অপ্রস্তুতই হলাম। অর্বাচীন হওয়ার মস্ত সুবিধা—আদর্শ চরিত্রের বিরুদ্ধে না যাওয়া। এই বুদ্ধি প্রয়োগে অল্পেতে রেহাই মিলল। বাকীটা অকিঞ্চনবাবু একাই টেনে নিয়ে চললেন। বেলা পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত চলল আলোচনা। মধ্যে বার দুয়েক চা এবং সেই সঙ্গে কিছু মানুষের আনাগোনায় প্রসঙ্গান্তর।

রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ছাড়াও ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনাও চলতে দেখেছি। সেই সঙ্গে সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি বিষয়ের ভাবনা কানে এসেছে— শিক্ষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ এলে হয়ত কিছু সাধ্যমত বলতে হয়েছে—নতুবা আমি কেবল শ্রোতাই তাঁর সভার। আশ্চর্য প্রসন্নতা ও অমায়িকতা আমাকে বারবার অভিভূত করেছে। স্ত্রী, পুত্রের অসুখ দুর্ঘটনাতেও তিনি অনেকখানি নির্লিপ্ত। বৈঠকে ঘরের সমস্যাকে কোনোদিন টেনে আনতে দেখি নি। কেউ প্রশ্ন করলে তাঁকে একান্তে সংবাদটুকু দিয়েছেন কেবল। পাঠাগারে বসে অনেকক্ষণ ধরে বই পড়েছেন। বাড়িতেও বই প্রতি সপ্তাহে নিয়ে আসতে দেখেছি। স্থানীয় বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী, অনেকের সঙ্গেই তাঁর ভাব-বিনিময় চলত। জ্ঞানান্বেষী, জিজ্ঞাসু হতে পেরেছিলেন বলেই বোধ করি এমন সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সকলে খুশী। শেষ বয়সে তাঁকে লাঠিভর দিয়ে পথ চলতে দেখেছি। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও অনেক সময়ে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আগ্রহভরে শুনেছেন। সংসারে সচ্ছলতা নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে দেখেই তিনি খুশী।

মাঝে-মাঝে সকালে বাজারে আসতে হয়। এক সব্জী বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম অকিঞ্চনবাবুকে। ধুতির একপ্রান্ত গায়ে জড়ানো। আমাকে দেখেই মাথা নত করে বলে উঠলেন, 'নমস্কার, নমস্কার মাস্টারমশয়।' খুবই লজ্জায় পড়তে হয় তরুণ-বয়স্ক এক শিক্ষককে এভাবে প্রবীণতম একজনকে নমস্কার করতে দেখলে। পরে বুঝতে পারি আসল নমস্কার আমাকে নয়, যথার্থই যিনি 'মাস্টার মহাশয়'—

''আচার্য'', তাঁকে। কুশল প্রশ্ন করে ফিরে গেলেন সেদিন একটু ব্যস্ত হয়েই। ঐ দোকানে সব্জী কিনবার সময় বারবার বিক্রেতা বলছেন 'বড় দয়ার শরীল বাবু, কত্তার। কত উপকার যে পাইছি, বলে বোঝাতে পারব না।' বেশ কিছুদিন বাদে একটু বেশী বেলায় একদিন অন্য খরিদ্দার নেই। আমার জন্য সব্জী ওজন করতে করতে বলে অকিঞ্চনবাবুর উপকারের কথা—'কঠিন অসুখে দু-সপ্তাহ বেচাকেনা বন্ধ ছিল, ওষুধ-পত্তরেও বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে যায়। সুস্থ হবার পরও পুঁজির অভাবে নামমাত্র সব্জী নিয়ে মুখ ভার করে বসে ছিল। হঠাৎ অকিঞ্চনবাবু এসে ওর খোঁজ-খবর নিলেন। ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনশ টাকা দিলেন। ওঁর দয়ায় সেইবার বেঁচে গেলাম কত্তা। ছয়মাসে তিনার টাকা শোধ করছি। এ উব্‌গার টাকায় শোধ করণ যায় বাবু?'

সত্যিই এমন উপকারের পরিশোধ টাকায় সম্ভব নয়। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে সংসার যেখানে চলছে কোনোমতে, সেখানে নির্দ্বিধায় মুহূর্তে তিনশ টাকা ঘর থেকে দিয়ে 'যখন পারো শোধ দিও' বলা সোজা কথা নয়। সদাপ্রসন্ন অকিঞ্চনবাবু সকলকে প্রসন্ন দেখতে চান। তাই গোপনে অপরকে এমনটি না করে ভালো থাকার অর্থ যে এমন ব্যাপক হতে পারে কারো কারো কাছে, তা অকিঞ্চনবাবুর সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না হলে হয়ত অননুভূত থেকে যেত। যখনই দেখা হয়েছে, 'কেমন আছেন' প্রশ্নের উত্তরে দূর-নিকটের কোন না কোন প্রতিবেশীর সমস্যার কথা বলতে শুনেছি। তাঁদের সমস্যা, সুহৃদজনের সাহায্য ও নিজের সামর্থ্যমত দূর করার প্রাণপণ চেষ্টাই ছিল তাঁর ব্রত। কোন কোন সময়ে কিছু করতে না পারায় বেদনায় শুধু চোখের জল ফেলেছেন। সমস্যা উত্তীর্ণ হয়ে তাঁদের কেউ সাফল্য পেলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন—নেমেছে দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু। ভাল থাকার আনন্দ বুঝি সুপ্ত আমাদেরি মধ্যে—নিজেকে কতটা অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি তার মধ্যে। কবি অতুলপ্রসাদের গানটি মনে পড়ে—'আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই। দু'জন যদি হত আপন হত না মোর আপন সবাই।'

আজকের সমাজ, আজকের জীবন কি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে? আমরা কি খুবই আত্মকেন্দ্রিক? যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গিয়ে যত পৃথক পৃথক সংসার হয়েছে তত বেশী আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি, একথা ঠিক। তবুও প্রতিবেশিজনের জন্য ভাবনা বিলুপ্ত হয় নি। কিন্তু কিভাবে এ ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় বা এর বিস্তার কিরূপে সম্ভব? পৃথক থেকেও মনে হয় আগে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে নিবিড় যোগ, সম্প্রীতি বজায় রাখা আবশ্যক। তবেই তা অন্যান্য প্রতিবেশীদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করতে পারবে। মনে এসব ভাবনা ভীড় করে এক এক সময়। — সেদিন বোধ করি এই ভাবনাটা আমার মনের রাজ্যটাই দখল করে নিয়েছিল।

সপ্তদশতম অধ্যায়

সাবিনাশের কথা

'আরে সবিনাশ যে—এসো এসো'—দরজার বাইবে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিবাদী কণ্ঠে উত্তর আসে সবিনাশ নয়, সাবিনাশ—'অবিনাশের সহিত বর্তমান'—অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যে সব সময আছে। দু'জনেই দু'জনের হাত ধরে অট্টহাসিতে গোটা বাড়িটাকে চমকে দেয়।

লাঠিগাছা ঘবের এককোণে বেখে অবিনাশের বৈঠকখানা ঘরের ইজিচেযারটায় একটু আরাম করে সাবিনাশ। 'কেমন আছ ভায়া'? —গড়গড়ার নলে তামাক খেতে খেতে প্রশ্ন করে অবিনাশ।

'কেমন আছি জানতে চাইছ, চোখ-কানের মাথা খেযে বসেছ নাকি? জানাবার কিছু আছে?' সাবিনাশ গর্জে ওঠে—'চব্বিশ ঘণ্টাই তো দেখছ, শুনছ, জানছ। ছোট নাতি পড়ছে—আমরা বাঙালি, বাংলায় বাস করি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষায় আমার কথা বলি।'

কথা বলি বটে, তবে বলতে ঘৃণা বোধ কবি। লজ্জিত হই এই মাতৃভাষার জন্য। আজকাল বেশীরভাগ মায়েরা যেভাবে ইংরেজীতে কথাবার্তা শেখাচ্ছেন, তাতে অচিরেই ছেলেমেয়েরা বাংলা ভুলবে। বেশ কিছু বাঙালী তো এখনই তাদেব সন্তানদের বাংলা শেখাচ্ছেন পয়সা খরচা করে। পড়ছে 'ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। আচরণে তো তা মনে হয় না। দেশ আছে কিনা সন্দেহ।' রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন—'দেশের খোঁজ নেই, হিত নিয়ে মাতামাতি।' এরকম দেশহিতের তাই তিনি নিন্দা করেছেন। দেশে বাস করে আমরা দেশের খবর রাখি না। দেশের বিরাট অংশ বাস করে গ্রামে। সেই গ্রামের খবর রাখি? তাকে অবজ্ঞা করি, উপেক্ষা করি গ্রামের মানুষকে। আমরা চাই তারা চিরদিন থাকুক আমাদের পায়ের তলায় আর আমাদের দু'বেলা সেলাম করুক। দেশের সীমানা পার হয়ে অন্যদেশের মানুষ ঢুকে পড়েছে। এদেশের অন্নবস্ত্রে ভাগ বসাচ্ছে। আমরা উদার হয়ে বলছি—আহা, ওরা তো আমাদেরই লোক— বাঙালী। অতএব যত খুশী এখানকার খাদ্য ওদেশে পাঠাও, দোষ কিছু নেই।

'তুমি চোরা-চালানের কথা বলছ...' অবিনাশের কথা কেড়ে নেয় সাবিনাশ— 'চোরাচালান' শব্দটি এখন উঠে গেছে। সীমানায় চাকরী করে আমার এক ঘনিষ্ঠ

বন্ধুর ছেলে। সে বলে, দু'বেলাই সীমানার ওপারে বাংলাদেশে জিনিস যাচ্ছে। সীমানার দু'মাইলের মধ্যে বসবাসকারী এদেশের ঐসব এলাকার বেশীর ভাগ মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য চাকরী করে না। এপার থেকে কিছু জিনিস ওপারে পাঠিয়ে



নিত্য উপার্জনের বন্দোবস্তে ভালভাবেই দিন যাপন করছে তারা। দেশের উৎপাদন আজ প্রতিনিয়ত বাধা পাচ্ছে। ধর্মঘট আর বন্ধ লেগেই আছে। আবার ইউনিয়ন তৈরী হয়েছে কাজ পণ্ড করার জন্য। নেতাদের মুখে দু'বেলা দেশকে শিল্পোন্নত করার কথার ফুলঝুরি। লেখাপড়ায় কিভাবে পিছিয়ে পড়তে হয়, তার বড় দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন বঙ্গসন্তানগণ। ভাষাজ্ঞান ব্যতিরেকেই তাঁরা জ্ঞানী হবেন। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত তিনটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থার আজ চরম দশা উপস্থিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা ব্যাকরণকে ছাঁটকাট করতে গিয়ে বঙ্গভাষা শিক্ষার পথকে তাঁরা সঙ্কুচিত করেছেন। দুঃখের কথা, শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ-বিহীন অনেকেই এ বঙ্গে আজ শিক্ষা-ব্যবস্থার নির্ণায়ক।'

'বাঙালী আজ অনেক অখাদ্য-কুখাদ্যকে সুখাদ্য করে নিয়েছে—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক হয়েছে একদল হিন্দু নিজেদের ধর্মাচার পরিত্যাগ করে গর্বভরে বিজাতীয় আচার বা অনাচারকে অনায়াসে বরণ করে নিয়ে অতি আধুনিক হওয়ার গর্ব প্রকাশ করছেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা কোনও ধর্মাচারই পালন না করে অর্থাৎ অনাচারী হয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার চেষ্টায় মেতেছেন। এসব কাণ্ডকারখানার পশ্চাতে রয়েছে বিশেষ এক ধরনের সুবিধাবাদী মনোভাব। দেশের কিছু রাজনীতিক সাধারণ মানুষের অর্থ লুটে নিচ্ছেন। এক একটি উন্নয়ন-খাতের বিপুল অর্থ যথাযথ ব্যয় হচ্ছে না। এইসব নেতা অনেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে এসে নীতি আদর্শ সততা বিষয়ে বক্তৃতাও করছেন। রাজনীতি আজ নোংরামির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। লোকসভা, বিধান সভায় চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি, ভাঙচুর, গালি, হাতাহাতি সবই চলে। অনেকেই এখন বলেন, বিনা পরিশ্রমে পয়সা-সম্মান লুটবার অন্যতম ক্ষেত্র দেশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ। কিছু ব্যতিক্রম আছে ঠিকই। কিছুকাল বাদে হয়ত মুষ্টিমেয় সেই আদর্শ মানুষগুলিও সরে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন।'

'ইস্কুল-কলেজে পড়ানো আজ কি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হয়েছে, চাকরীর বাজারে আজ কেমন আগুন লেগেছে, তা দেখেও কেমন আছি জানতে চাইছ? রেশনে আগুন, বাজারে আগুন, কেরোসিনে, রান্নার গ্যাসে আগুন, কর্মে আগুন, ধর্মে আগুন—মানুষ্যত্বের এ আগুন নেভাতে পার? তবে ভাল থাকব, বন্ধু। 'আর ভালোতে কাজ নেই, এবার ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।'

অষ্টাদশতম অধ্যায়

প্রাণকৃষ্ণ, সুনীতিবালা ও শিবশরণ

জামসেদপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনদিনব্যাপী ঠাকুরের জন্মোৎসব। পূজা-পাঠ আরতির সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বক্তৃতা ও গানের ব্যবস্থা মাতিয়ে রেখেছে। মহারাজ ও অন্যান্য সেবকগণ সদা ব্যস্ত হয়ে কাজের পিছনে ছুটে চলেছেন। কলকাতা ও অন্যান্য জায়গা থেকে বক্তা ও সঙ্গীতাদির শিল্পিমণ্ডলী এসেছেন। দুজন শিল্পী অসুস্থ হয়ে পড়লে মহারাজ ছুটে গিয়ে ওষুধ দিয়ে আসছেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খোঁজ নিচ্ছেন। পথ্যের ব্যবস্থাও করছেন। সদাহাস্যময় তিনি প্রবীণ হয়েও নবীন যুবক। দু'হাজার একের সাতাশে ফেব্রুয়ারী সকালে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ছি— কেমন করে সন্ধ্যায় রামায়ণ গান হবে? মহারাজ নিশ্চিন্ত—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই ঠিক হয়ে গেল। নিখিলদার শরীর একটু দুর্বল থাকলেও গানে বিশেষ অসুবিধা হল না। আশ্চর্যের ব্যাপার—সকালে সকলেই দুশ্চিন্তিত থাকলেও মহারাজ কিভাবে এত নিশ্চিন্ত হলেন!

এখানকার বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন বিভাগের একটি ছাত্র অসুস্থ। মহারাজ মুহূর্তে ওষুধপত্র সমেত উপস্থিত। পরিচর্যান্তে মিশনের গাড়িতে করে নিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বাড়ির সকলকেই আশ্বস্ত করে এলেন।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে এই অঞ্চলে দাঙ্গায় বেশ কিছু মানুষ হতাহত হবার খবর পেয়ে এই আশ্রমের পূর্বতন এক মহারাজ সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই দাঙ্গাস্থলে ছুটে গিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঙ্গা থামল। ভোগী আর ত্যাগীতে জীবন-মূল্যের কী তারতম্য!

প্রাণকৃষ্ণ তবলা, শ্রীখোল, হারমোনিয়াম বাজায়। নামগানের আসরে প্রয়োজনে গানও গায়। সপ্তাহের চারটি দিন নির্দিষ্টভাবেই ও নিযুক্ত রয়েছে। বাকী দিনগুলিতে ডাক এলে যোগ দেয়। ওর দাদাও একইভাবে এই বৃত্তিতে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। ওদের পিতৃদেব শুনলাম একজন বড় সংগীত শিল্পী ছিলেন। বহু জায়গায় গান গেয়ে প্রভূত উপার্জনও করেছেন। প্রাণকৃষ্ণ বাল্যেই পিতৃহারা। তাই জীবিকা নির্বাহে দুইভাইকে আরো বেশী করে এই বৃত্তির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

বললাম, 'প্রাণকৃষ্ণ, তুমি ত কত ভাল ভাল শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গত্ করছ, কত সম্মান-সমাদর পাচ্ছ। কত আনন্দের কথা!'

ও বলল, 'আমাদের আর সম্মান-অসম্মান কী! গাইয়ের সম্মানেই আমাদের সব। তিনি ভাল গাইলে সকলের ভাল, আর মন্দ গাইলে আমাদের কী? আমাদের পারিশ্রমিক মিললেই হল! তবে মাঝে-মধ্যে দু'এক জায়গায় বাজিয়ে হিসেবে খুব সম্মান মিলেছে।'

—এই যে এত ছবি তুলছে সবাই—তুমি ফটো পেয়েছ কখন?

প্রাণকৃষ্ণ বলে, 'ছবি আমাদের দেবে কেন? আমি কখনো পাই নি।' ছয় বছরের অভিজ্ঞতায় ও বুঝেছে অধিকাংশ মানুষ গানকেই বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন। বাজিয়ের কথা পৃথকভাবে ভাববার মানুষ বিরল। রূঢ় বাস্তবের কঠিন আঘাত ওর শিল্পীসত্তাকে কতকটা সুপ্ত করেছে। উপার্জনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে গিয়ে ওর সাধনার ব্যাঘাত ঘটছে—একথা ও মেনে নিল। পিতৃহারা প্রাণকৃষ্ণ বালক বয়স থেকে এপর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তাতে ও বুঝেছে আগে চাই টাকা। জীবনে দাঁড়াতে হলে এই টাকা না হলে চলবে না। সম্মানের কথা ভাববার অবকাশ ওর অল্পই মিলেছে। নবীন প্রতিভার কেন এমনটি হয় বুঝে উঠতে পারি না।

হালে গড় আয় যার তিন হাজার—তাও কখন যে কোন্ স্তরে নামবে তার স্থিরতা নেই, তার পক্ষে ভবিষ্যৎ-ভাবনা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবেই—বিশেষ করে পরিপূর্ণ সংসার জীবনে প্রবেশের কথা মাথায় রাখলে ভাবনার অনুষঙ্গ ওকে আপাতত মেনে নিতে হবেই।

মহারাজ সেদিন বললেন নিজের চাওয়াটা ঠিক করতে পারলে পাওয়া নিয়ে আর ভাবনা থাকবে না। খাঁটি কথা। কিন্তু ওই ঠিক চাওয়াটা ফুটতেই যে জীবনের বেশীর ভাগ সময় পেরিয়ে যায়। আমাদেরই এই অবস্থা, আর পিতৃহারা যুবক প্রাণকৃষ্ণ কতটা করবে! মহারাজ আমাদের ভাবনার ভুল ধরিয়ে দিলেন। প্রাণকৃষ্ণের চাওয়াটা যে কোনো মুহূর্তেই অন্যরূপ নিতে পারে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ও সুনিশ্চিত সুপার্জক হয়ে শান্তিসুখের অধিকারী হতে পারে, আবার পারমার্থিক ধনে ধনী হয়ে এই উপার্জনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেও সমর্থ হতে পারে ও।

ঘাটশীলার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে 'লবকুশ' পালা গান হবে আজ আঠাশে ফেব্রুয়ারী। বিকেল থেকেই মেঘ জমছে আকাশে। এখন সাড়ে পাঁচটা। গান সাতটায়। তাহলে অনায়াসেই একটু বেড়িয়ে আসা যায় সুবর্ণরেখা নদীর ধারটায়।

বললাম, —'চল যাই, তুমি তো দেখ নি। ভাল লাগবে।' পথে পড়ল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ছোট্ট বাড়িটি। আজ জনহীন, রুদ্ধদ্বার। পড়ে আছে পথের মানুষদের জন্য। সম্মুখের প্রস্তর-ফলকে তাঁর সহধর্মিণীর কিছু কথা

স্মৃতিকে ঘিরে। মেঘে-ঢেকে-যাওয়া সূর্য— দেখা গেল না সুবর্ণরেখার বুকে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম স্বর্ণলেখা। কিন্তু প্রাণ ভরে দেখা গেল গ্রামের মানুষগুলি। ঘরে ফিরছেন অনেকে। কেউ বা সঙ্গীদের সঙ্গে গল্পরত। মেয়েরা একটি মাত্র পুকুরের জল নিয়ে ফিরছেন। এই সময়টায় খুব জলকষ্ট এখানে। প্রকৃতি প্রাণকৃষ্ণের প্রাণকে জাগিয়েছে। ওর অবসাদের ঘুম ছুটেছে। কথাবলার মানুষও কম পেয়েছে। আজ একটু অবসর মেলায় ও যেন অনেকটা খুশী। ওর জীবনের ব্যথা-বেদনা-আকাঙ্ক্ষা দরদী মানুষের কথা হাফ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। নদীর স্নিগ্ধ বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে আসি। বৃষ্টি দু'এক ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। শেষে ভিজতে হবে কি? হোক না, ক্ষতি কি? দ্রুত পায়ে এসে পড়েছি ঘরে। মেঘের গর্জন বাড়ছে—বৃষ্টিও ক্রমে বাড়ল। ভিজেমাটির গন্ধ অনেক দিনের মনের মানুষের সন্ধান বয়ে আনে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমেও তিনদিনব্যাপী উৎসব চলছে। প্রবেশদ্বারের সামনেই সামিয়ানা টাঙান হয়েছে—অনেকগুলি চেয়ার সারি দেওয়া। কিন্তু এসব আয়োজন বৃথা গেল। বৃষ্টি ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করল। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন মন্দিরের বারান্দাতেই রামায়ণ গান হবে। লবকুশপালাই এখানে নির্বাচন করা হয়েছে। হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি পাল্লা দিয়ে চলল গানের সঙ্গে সঙ্গে। গান শেষ হলেও বৃষ্টি থামে না। লবকুশ সীতাকে মধুর রামায়ণ গান শোনাল। ভক্তবৃন্দও তা শুনলেন। বৃষ্টিধারা অশ্রুভরা বেদনা হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

...বৃদ্ধা সুনীতিবালা নিখিলদার পায়ে প্রণাম করে বললেন, 'বাবা, কী গান শোনালে! রামায়ণ অনেক শুনেছি— কিন্তু আজ যেন কত সহজে চোখের জল আন্‌লে'—

দেখুন, সবই আমার পিতৃদেবের কাছে পাওয়া, আর আপনাদের মত ভক্তদের কৃপার বলে—আমি নিজে হতভাগা।

মন্দিরের এক সংগঠক পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বললেন, 'বড় ভক্ত। মন্দিরের জন্য দু'লক্ষ টাকা দান করেছেন। ওর স্বামী টাটাতে বড় অফিসার ছিলেন। অবসর নেওয়ার দু'বছর বাদেই সবাইকে ছেড়ে গেলেন। এ মন্দিরের জন্য অনেক করেছেন। জমিজমা সম্পত্তি অনেক করেছিলেন নিজে। জীবনের শেষ পর্বে বেশীর ভাগই বিলিয়ে দিয়ে গেলেন সেবা প্রতিষ্ঠান মঠ-মিশনে। দুই ছেলে—একজন বিদেশে, অপর জন দেশে বড় ইঞ্জিনীয়ার। ওদের জন্য বাড়ির সংলগ্ন একটু জমি ছাড়া আর সবই জীবিতকালেই দানপত্র করে গেছেন।' হিতৈষী দু'চারজন বলেছিলেন, 'ছেলেদের জন্য কিছু রাখ'। 'হেসে উত্তর দিয়েছেন—ভাল চাকরী

করছে—সম্পত্তি তো ওদের হাতের মুঠোয়। এত সব কি হবে! নিজেরা কষ্ট করে সম্পত্তি অর্জন করতে শিখুক। এখন একটু আরাম কমলেও, তাতে ওরা ভাল থাকবে।'

হঠাৎ বৃদ্ধা করজোড়ে বলেন 'ছেলেরা সুখে সংসার করছে, ঠাকুর ওদের কোন কষ্ট রাখেন নি।' বৃদ্ধার এক সঙ্গিনী বলে উঠলেন, 'সব থেকেও দেখুন ওর কাছে কেউ নেই। দূরে দূরে চাকরী সব ছেলের। বাড়িতে প্রাচীন এক ভৃত্য ছাড়া কেউ নেই।' 'কী বলছেন এসব? জাগ্রত ঠাকুর ওঁর ঘরে বসে বারো বছর ধ'রে দেখছি। আর আপনি বলছেন উনি একা। ঠাকুর আপনার চিরসঙ্গী, ঠাকুমা।' মাথা ঠেকায় সংগঠক মন্দিরে।

মন্দিরের পশ্চাতে রন্ধনশালা ও আহারাদির ব্যবস্থা রয়েছে। দুপুর ও রাত্রের আহারে সঙ্গ দিয়েছেন শিবশরণজী। মহারাজের কাছে পরিচয় পাবার পর বিস্মিত হয়েছি। একমাত্র সন্তানকে রামকৃষ্ণ মঠে সমর্পণ ক'রে স্বামী-স্ত্রী প্রকাণ্ড বাড়িতে জীবন-যাপন করছেন।

স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার পর পুত্র নিজেই ওই জীবন বরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে পিতামাতা বাধা না দিয়ে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। ঘাটশীলাতেই বাড়ি। শুনলাম বাড়িতে কমই থাকেন। স্ত্রী পূজার্চনা জপ-তপেই সময় কাটান, মন্দিরে আসেন। শিবশরণ বাড়িতে খোঁজ-খবর নেবার জন্য মাঝে মধ্যে আসেন। আশ্রমে কাজের চাপ পড়লে বাড়ি ফেরেন না। প্রতিবেশীরা বলেন, ওঁর বাড়িটি আর বাড়ি নেই, মন্দিরই হয়ে উঠেছে। রামচন্দ্র আর শিবের সুন্দর প্রস্তর মূর্তি ষাট বছর হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ দিনে পূজা পাঠ অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। উপর নীচের-পাঁচটি ঘরের মধ্যে দু'টি বাদে আর সব তালাবন্ধ পড়ে আছে। ওঁদের ব্যবহৃত দু'টি ঘরে আসবাবপত্রও সামান্য। খুবই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন দু'জনে। প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকে সোজা এগোলেই সুন্দর মন্দির। পূজারী প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পূজা করে চলেছেন নিয়মিত। মন্দিরটি দেখতে যাবার ইচ্ছা থাকলেও সময় হল না। রাত্রে ঘুম না আসা পর্যন্ত কেবলই ভাবছি শিবশরণজীর কথা। সকাল থেকে গভীর কূপ ও নলকূপ মেরামতের কাজ দেখাশুনা করছেন। জলের সমস্যা ও অঞ্চলে এই সময় থেকে মাস তিনেক খুব বেশী। তাই খুবই চিন্তিত দেখলাম সকলকে। ওদিকে স্নানাগার ও শৌচাগার সম্প্রসারণের কাজ করছেন রাজমিস্ত্রীরা। তাও দাঁড়িয়ে থেকে দেখছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে অতিথি-অভ্যাগতবর্গের পরিচর্যার জন্যও ছুটে আসছেন। মিতবাক্। কাজেই মন বেশী। নিজের হাতে সব জিনিস আনা-নেওয়া করছেন সদাপ্রসন্ন শিবশরণ। জানি না মনে মনে তিনি গাইছেন কিনা—'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি/আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।'

উনবিংশতম অধ্যায়

নিবারণের কথা

'পাঁচ টাকা চাইছি তাও দেবা না, ডাব খাবা বাবু?'

আমরা বাঁসি (বাঁচি) ক্যামন কর্য়ে!' —ডাব কাটতে কাটতে একটু হেসে নিবারণ বলে।

'ডাব বিক্রী করছ কত বছর, নিবারণ?' আমার কৌতূহল মেটাতে ওর উত্তর, 'তা ধরেন গিয়ে তিরিশ বছর হবে নে। তার আগে সব্জী বিক্কিরি করিছি বছর পনেরো। ওতে সুবিধে কত্তি পারলাম না। তাই ডাব ধরলাম।'

বললাম, 'শুধু ডাবই বিক্রী কর, না আরো কিছু কর?' ও জানাল এটাই ওর একমাত্র উপার্জনের পথ। 'দিনে কত পাও?' আমার প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'আজ্ঞে, তা গড়ে পঞ্চাশ টাহা মত থায়ে। কেনা-আনার খরচ বাদ দিলি প্রতি ডাবে দুই-আড়াইর বেশী পাই নে।'

পড়ন্ত বেলায় একদিন ওর সংসারের কথা শুনিয়েছিল। কষ্টের সংসারে খুশী। কিন্তু অবাক হতে হয় ওর কথা শুনে—ওর নাকি কষ্ট নেই। বিলকান্দায় বাড়ি। তিন মাইল পথ রোজ ভ্যানে আসে, ফেরার সময় হেঁটেই বাড়ি ফেরে কিছু কেনাকাটা ক'রে। ছেলেটি নাইনে উঠবে এবার, মেয়েটির হবে ফাইভ্। খুলনার রূপসা নদীর পারে ছিল বাড়ি। দেশভাগ হওয়ার দশ বছর পর এই দেশে আসে ওর মা, দুই ভাই আর এক বোনকে নিয়ে। বাবা ও দেশেই গত হয়েছেন। চারকাঠা জমি ও ঘর তৈরীর জন্য সরকারী সাহায্য পেয়েছিল বলে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু করতে পেরেছে। ওর ঘরের পোতা আর মেঝে পাকা। টিনের চাল আর মুলিবাঁশ— কাঠের সিলিং। নিজের রোজগারে ও টিউবওয়েল আর পাকা পায়খানা তৈরী করেছে। ভাইদের দুটো পাস করিয়েছে। একটা পাসের পর বোনটির বিয়ে দিয়েছে নীলগঞ্জে। সুখে আছে তারা। দুই ভাইয়ের একজন প্লাস্টিকের এক কারখানায় কাজ করে, অপর জন পান-বিড়ির দোকান করেছে। ওরা কাছাকাছি থাকে। নিবারণের সংসারে এখন আছে ওর মা, স্ত্রী, দুই ছেলেমেয়ে আর ও নিজে।

বললাম, 'ভাইদের মানুষ করলে, রোজগার করতে শিখে তোমায় কিছু দিয়েছে? ওদের আলাদা করলে কেন?'

ও হেসে বলে 'ছিঃ ছিঃ, তাই কি করা যায়? একমায়ের পেটের ভাই, বাবা মারা গ্যালেন, আমি বড়, আমারি তো ওদের দেখ্‌তি হবে। আর ওরা আমারে ছাড়্যে যায় নি, রোজগার করতি শিখলি আমিই ওদের আলাদা ব্যবস্থা কর্যে দিছি। ক্যামন ভাল আছি কন্ তো? রোজ ওরা এ বাড়ি আসে। সবার সঙ্গে দেখা কর্যে যায়। আমার দুই ছেলেমেয়ে আর মার জন্যি কত কি আনে। সুখে দুখে এক আছি আমরা সকলে, বাবু। এ্যাহোন ওদের সংসার হইছে, কত খরচ! আমি বড়, আমার তো এ্যাহোনো দেখ্‌তি হয়।'

মাটির ঘর খড়ের চাল ছিল প্রথমে নিবারণের। দু'বছর অন্তর খড় যোগানো কঠিন হয়ে উঠল দেখে ও টিনের চাল তৈরী করে। তারপর নিজের উপার্জনেই ঘরের মেঝে পর্যন্ত পাকা করে নিয়েছে।



বললাম, 'দেড় হাজার টাকায় তোমার সংসার চলে কেমন করে?' ও জিব কামড়ে একটু হেসে উত্তর দিল—'তাই কি হয় বাবু, পরিবার দু'বাড়ি কাজ করেন, তাই সংসারডা আছে। ঘরে বসে সবাই প্লাস্টিকের প্যাকেট তৈরী করেও কিছু রোজগার হয। ছেলেমেয়েদের বেশী কর্‌তি দিইনে। আমি বলি, তোরা পড়াশুনা কর ভাল কর্যে। তবে ইস্কুল ছুটি থাকলি ওরা এট্টু বেশী কাজ করে। মাস্টার রাখ্‌তি পারিনি বাবু। ইস্কুলির যামিনী মাস্টারবাবুর বড় দয়ার শরীল। বিনে মাইনেতেই সপ্তাহে তিনদিন কর্যে পড়ান। বইপত্তরও তিনিই বেশীর ভাগ দেন। তা ওরাও বাবু পড়াশোনাডা করে মন দিয়ে। আপনাগো আশীব্বাদে আট কেলাস/পাঁচ কেলাস তো পাশ করল।'

—আচ্ছা নিবারণ, কোনদিন ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী, সাহেবকে নিজের হাতে ডাব খাইয়েছ? আমার প্রশ্ন ওর মুখে এক প্রসন্নতার ছোঁয়া লাগল। বলল—'আজ্ঞে, তা বাবু মন্ত্রীবি সামনে পাইনি। তবে আমাদের বিডিও সাহেব গাড়ি থামিয়ে সোদপুর রোডে আমার ডাব খেয়েছেন। দুটো ডাব খালেন।' দাম কত জান্‌তি চালি বললাম — 'সাহেব, তুমি আমাগে অতিথি। আমাগো গেরামে আইছ। পয়সা নেব না।' সাহেব শুনে বললেন, 'ঠিক আছে। দাম দিচ্ছি না।'

একখানা পঞ্চাশ টাহার নোট বার কর্যে জোর কর্যে আমাব হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌লেন, 'তোমার ছেলে-মেয়েদের কিছু কিনে দিও।'

'আপনাগো আশীব্বাদে বিদেশী খাঁটি সাহেব অনেককেই ডাব খাইয়েছি। তাঁরা খুব খুশী হয়ে অনেক বেশী পয়সা দেছেন। তবে বাবু, হাসাপাতালে নিয়ে যাবার সময় এক রোগী জল না পায়্যে মরমর হলি তাড়াতাড়ি আমি এট্টা ডাব ক্যাটে খাওয়ালাম। রোগীর আরাম হ'ল্য। কী শান্তি বাবু সেদিন পাইছি— কোনোদিন ভুলতি পারব না।'

এরপর কয়েক বছর কেটে গেছে। নিবারণের সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ চৈত্র মাসের একটি দিন ঘোলার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের এক কীর্তনের দলে দেখি নিবারণ গান গাইছে। নৌকাবিলাস পালাগান শেষ হলে কাছে যেতেই ও এসে প্রণাম করল। নিবারণ করার চেষ্টা বৃথা বুঝে নীরব রইলাম।

বললাম, 'তুমি যে গান কর, তা এতদিন ত জানতে পারিনি।'

'আজ্ঞে বলার মতো কিছু জানি নে। আমারে শেখায়ে পড়ায়ে নেছে একজনা'—ওর বিনীত উত্তর।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতদিন হল গান গাইছ'? ও বলল, 'তা বছর আষ্টেক হবে নে, বাবু।'

'গানের দলে আছ। টাকাকড়ি কিছু পাও তো?' আমার প্রশ্নের উত্তরে ঘাড়

নেড়ে বলে 'আজ্ঞে পয়সা সামান্য হলি কি হবে, আসল যা পাই তা কি পয়সা দিয়ে পাবার জিনিস? শান্তি—বাবু, শান্তি। মনডা শান্তি হয়। পরানডা খুশী হয়। শান্তি পাই কত। লেহাপড়া আমার হল্য না। এইট্ পাসও কত্তি পারিনি। বাবা স্বগ্গে গ্যালেন। সবারি দেখ্তি হল্য—নিজের পড়া আর হল্য না। তা এই কীর্তনে বাবু আপনাগো আশীব্বাদে যা শিখিছি তাতে যে কী আনন্দ, তা আপনারে বোঝাতি পারব না।'

বিধাতা-পুরুষের বিচিত্র বিধান দেখে অবাক হই— যেখানে বিত্ত আছে, সেখানে চিত্ত নেই; আবার যেখানে চিত্ত আছে, সেখানে বিত্ত মেলা ভার!

বিংশতম অধ্যায়

ভাল আছে অখিলেশ

অবকাশ-আবাসের রবিবারের বৈঠক তখনও শেষ হয়নি। বেলা প্রায় বারোটা। অখিলেশ তাঁর রঙ্গালয়ে প্রাচীন অভিজ্ঞতার কথা বলে চলেছেন—ব্রজদাকে নিয়ে বিশ্বরূপা থিয়েটার হলে গিয়েছি পরবর্তী সপ্তাহের টিকিট সংগ্রহ করতে। তারাশঙ্করের 'আরোগ্যনিকেতন' চলছে। বেশ ভীড়— পাবার আশা খুবই কম। দু'টি উদ্দেশ্যে আসা—ক্ষীণ আশা, যদি টিকিট মেলে আর যদি দু'এক দুর্লভ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। হঠাৎ কেষ্টদার আবির্ভাব। কেষ্টদা এই থিয়েটারের ব্যবস্থাপকদের অন্যতম। দেখা হতেই 'আরে অখিল ভাই, চল চল থিয়েটার দেখবে, এখনই আরম্ভ হবে। কতদিন দেখিনি তোমায়। সঙ্গে বন্ধু বুঝি— নমস্কার, নমস্কার'। আমার দিকে চেয়ে মাথা নোয়ালেন। বললেন, 'আসুন আসুন আর দেরী নয়।' জায়গায় বসতে বসতেই চা এসে গেল। প্রথম 'বেল্' বেজে গেছে। দ্বিতীয় ঘণ্টা এখুনি বাজবে। অভিনয়ের সাংগঠনিক কথাবার্তা জুড়লেন অখিলেশের সঙ্গে। আমি চিন্তা করছি কী বিপদেই না পড়া গেল। বাড়িতে বলা-কওয়া নেই, তাই দুশ্চিন্তা অথচ দেখবার লোভও হচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো অভিনয় দেখলাম। শেষ হলেও উঠছি না—একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি দেখে কৃষ্ণলাল সেন কাছে এসে একটু জোরেই বললেন— 'কেমন লাগল?' আমাকে খুব খুশী দেখে একটু গর্বের হাসি হাসলেন। জীবন-সত্যের, জীবন-দর্শনের এমন মর্মসত্য এমনভাবে মঞ্চেও উপস্থাপিত হতে পারে—ভাবা যায় না। ব্রজদাও তার খুশীর কথা জানালেন। ধন্যবাদ সকলকে— বিশেষ ক'রে কেষ্টদাকে। বহুদিন পর এমন নাটক—এমন অভিনয় কপালে জুটল, খুব খুশী আমি।

অখিলেশবাবু চিরকালই স্বাধীনচেতা নির্ভীক মানুষ। অন্যায়-অসত্যের সঙ্গে কোনোদিন আপোষ করতে শেখেননি। আর তার ফলেই প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরীটি খোয়ালেন বাষট্টি সালেই। সেই থেকে দু'বেলা ছাত্র পড়ান। ইংরেজীই তাঁর মুখ্য বিষয়। বেশ কয়েক বছর ভালো উপার্জন করেছেন। মাঝে নিজে ও পরিবারের স্ত্রী-পুত্রকন্যা পালাক্রমে অসুস্থ হয়েছে। এর ফলে ছাত্র কমেছে এবং সেইসঙ্গে আয়ও। কয়েকবছর ধরে পরিবারে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। তারই

মধ্যে জীবন-সংগ্রামে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সংসার রক্ষা করেছেন। দেখতে দেখতে কন্যা অনার্স পাস করল। এবার এম. এ. পড়ারও ইচ্ছা তার। ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে সেও তার পড়ার খরচ চালিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পড়বার সময় থেকেই। মধ্যে মধ্যে কন্যাকে পড়ার খরচের জন্য টাকা দিতে গেলে অণিমা বলেছে, 'আমার ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পেরেছি, বাবা। তুমি বরং মাকে দাও সংসার খরচের জন্য।' ভাই সৌরভকেও মধ্যে মধ্যে বই কিনে দিয়েছে। মা-বাবার প্রতি ওর কর্তব্যবোধের এই পরিচয় গর্বের বিষয়। পরীক্ষা দিতে গিয়ে এক সময় অণিমা পীড়িত হয়েও সংসারের সাময়িক অভাব মিটিয়েছে হাসি মুখে। ওর বি. এ. অনার্সের ফল আরো ভালো হ'তে পারত পার্ট ওয়ানের সময় কঠিন অসুখটা না হলে। 'টিউটর'-এর কাছে পড়ার ইচ্ছা থাকলেও সংসারের অবস্থা দেখে সে তা কোনোদিন মুখেও আনেনি। শুধু কলেজের সহপাঠিনীর কাছেই তা ব্যক্ত করেছিল। এম. এ.-তে ভর্তি হতে পারলে ওর ইচ্ছা আরো দু-একটি টিউশন জুটিয়ে ভাল অধ্যাপকের কাছে প্রথম থেকেই পড়বে। সৌরভের জন্য একজন সদাশয় 'টিউটর' যৎসামান্যের বিনিময়ে পড়াতে রাজী হয়েছেন। ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে।

নাটক অভিনয় আর সাহিত্যচর্চার শখ অখিলেশের বহুদিনের। সাংসারিক চাপে ইদানীং অভিনয়চর্চা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যচর্চা আজও বজায় রেখেছেন। বজায় রাখার চেষ্টা অন্তত করেছেন বললেই ঠিক বলা হয়।

অবকাশ-আবাসে শ্রাবণ-মেঘের ঘনঘটার একটা দিন চা মুড়ির সঙ্গে বেগুনীটাও যখন বেশ জমে উঠেছে, অখিলেশের অশরীরী অভিজ্ঞতার কথায় তখন আমরা সবাই নিমগ্ন। বেলা সাড়ে বারোটা হয়ে গেলেও কারোরই উঠবার ইচ্ছা নেই। প্রায় একটার কাছাকাছি সঙ্গী তনয়রঞ্জনকে নিয়ে উঠে পড়লেন। নবীন সেন নগরের এ আবাস থেকে বৈকুণ্ঠপুর দু'মাইল পথ।

পনেরই আগস্টের একটি সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ নিয়ে গেছি তাঁর কাছে অনুষ্ঠান দিবসের সাতদিন আগে। বুধবার একটু দূরে পড়ান থাকে। তাঁর বাড়িতে পুত্র-কন্যা-স্ত্রী খুবই উৎসাহিত আনন্দময় হয়ে উঠল আমাকে পেয়ে। অখিলেশ ফিরলেন প্রায় সাড়ে বারোটায়। ওঁর স্ত্রীর কিছু লেখা শুনছিলাম। সরল প্রাণের স্বচ্ছ প্রকাশ। জীবনের অনেক না-পাওয়াকে ছাপিয়ে আনন্দের এক একটি দৃশ্যের তোরণ পেরিয়ে চলা। থাক না পড়ে ভাষা-ছন্দের কিছু দুর্বলতা। মায়া-মমতা দিয়ে বাস্তবের যে কল্পলোক তৈরী হয়েছে, তা থেকে মন ফিরতে চাইছে না। কিন্তু ফেরালেন অখিলেশ ঘরে ঢুকে। খুশীতে উচ্ছল। 'কখন এলেন? কী সৌভাগ্য?' 'চা পেয়েছি কিনা' ইত্যাদি একগুচ্ছ প্রশ্ন করতে করতে গায়ের জামাটি খুলে আমার মুখোমুখী বসলেন। সভার আমন্ত্রণের খবরটা দিয়ে ফিরবার উদ্যোগ করতেই ওর সহধর্মিণী

আরতি দেবী পথরোধ করে বললেন, 'আজ আমাদের ভাতে ভাত—আপনিও আমাদের সঙ্গে ব'সে যান না? গিয়ে তো আপনার ব্যবস্থা করতে হবে নিজের হাতে... বেলা অনেক হয়ে যাবে।' আমি বিস্মিত- অভিভূত! কী কষ্টে অখিলেশের সংসার চলে কিছুটা জানি অথচ আশ্চর্য দ্বিধাহীন অভ্যর্থনা। মেয়ের পরীক্ষাপাশের পর একদিন আহার গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ভাবতে ভাবতে যাই—বিচিত্র সংসার! 'নিঃস্বের ঘরে চিত্ত, আর কত চিত্তহীন যে বিত্ত!'

তনয়ের মুখে পরে একদিন শুনলাম—মধ্যে মধ্যে উপবাসী থেকে মেয়ে কলেজে গিয়েছে। মাসখানেক বাদে দেখা অখিলেশের সঙ্গে মধ্যমগ্রাম কালীবাড়ির কাছাকাছি। দেখা হতেই এক গাল হাসি। রিক্সায় চলেছি মধ্যমগ্রাম মোড়ে। রিক্সা থামিয়ে অনুনয়ের পর ওঠানো গেল ওঁকে রিক্সায়। বারাসত চলেছেন কিছু প্রাপ্তিযোগের আশায়। বললেন, 'মোড় থেকে বাসে উঠলে ভাড়াটা বেশ কম হয়—বাড়ি থেকে এটুকু পথ হেঁটেই দিব্যি আসা যায়।'

—'তা ঠিক, একটু সময় নিয়ে বেরুলেই হল! এ বয়সে একটু হাঁটাও যে দরকার।' তাঁর কথার সমর্থনে বলি।

বছরখানেকের জন্য আমাকে বাংলার বাইরে চলে যেতে হয এক আশ্রম-পত্রিকা দেখাশুনার ভার নিয়ে। মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে এলেও অখিলেশের খোঁজ নিতে পারি নি বলে মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে। একবারই একটি চিঠিতে জেনেছি হঠাৎ ওঁর কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। পাত্রপক্ষ অভিজাত অবস্থাপন্ন বর্ধিষ্ণু পরিবারের। শিলিগুড়িতে দীর্ঘকালের ব্যবসা রয়েছে। কাজেই রাজরাণীই হয়েছে বলতে পারি। এরপর দীর্ঘদিন কোন খবর পাই নি অখিলেশের। এবার বাড়ি ফিরে একদিন খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি তিনি একটু দূরে পরমেশের বাড়ি গেছেন। আরতির কাছে শুনলাম মাসখানেক হল সৌরভের অসুখ হয়েছিল। বাঁচার আশা ছিল না। দু'জন সহৃদয় তরুণ চিকিৎসক সবরকম সুব্যবস্থা করে ওঁকে বাঁচিয়েছেন মারাত্মক টাইফয়েড থেকে। একটু বাদেই অখিলেশ ফিরলেন। তাঁর বিধ্বস্ত অবস্থাটি মুহূর্তে পাল্টে গেল আমাকে দেখেই। জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করেন, 'সব ভাল তো?' আমি কুশল জানিয়ে বলি, 'বহুদিন তোমার খবর নিতে পারিনি। তুমি কেমন আছ, তাই বল।'

পুরাতন সেই হাসি হেসে বললেন, 'বেশ আছি। সাংসারিক কর্তব্যে বারো আনাই ফাঁকি, তবু দু'বেলা জোটাচ্ছেন তিনি।' ব'লতে ব'লতে ওঁর গলা ধ'রে আসে। চোখের জলটা রুমাল বার ক'রে সামলান। আমার ত তবু চলছে, পরমেশের খুবই দুর্দিন। কোম্পানী বন্ধ ছ'মাস। কাজ নেই। তারও চলছে ট্যুইশনি ক'রে। মেয়েটাকে বোধ হয় বাঁচাতে পারবেন না। জন্ডিসটা একটু খারাপ দিকেই মোড়

নিয়েছে। আমাব জন্য ও এত করে—এই দুঃসময়ে ওকে একটু দেখতেই হয়। বেলা প্রায় বারোটা। স্নানাহারের সময় হল—আমি তবে উঠি। 'বসুন আর একটু, আমাদের তাড়া নেই—আজ মুড়ি - বাতাসাই দ্বিপ্রাহরিক আহার।' আরতি সবাব জন্য মুড়ির বাটি নিয়ে হাজির হয়। বাধ্য হয়ে আমাকেও যোগ দিতে হয়। আরতি আড়ালে ধরা-গলায় চুপি চুপি বললেন, 'পঞ্চাশ টাকার একটা নোটই ছিল। সকালে অখিলেশ তা নিয়ে গেলেন পরমেশের ছেলের জন্য।'

'বেশ আছি'র মর্মোদ্ধার করতে করতে পথ চলি।

একবিংশতম অধ্যায়

নিমেষের কুশাঙ্কুর

চন্দনপুকুরের শৈলেশদাকে বারাকপুরের সকলেই চেনে। ছোটদের সংগঠনের কাজে তাঁর ষোলো বছর কেটে গেছে। বিভিন্ন ড্রিল, কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী, হাতের কাজ, ছবি আঁকা কী না সে জানে! মুখে মুখে উৎকৃষ্ট ছড়া রচনা করে তাতে সুর দিয়ে গাইতে পারে। দরকারে অভিনয়ের মঞ্চ তৈরী করে সাজিয়ে দিতে পারে যদি যোগান দেবার মানুষ থাকে। বাড়িঘরে বৈদ্যুতিক সব ব্যবস্থাই সে সুষ্ঠুভাবে করে দিতে পারে দু'একজন সর্বক্ষণের সহযোগী পেলে। ছোটদের জন্য নাটক লিখে তাদের অভিনয় শিখিয়ে সহযোগী থেকে অভিনয় করানো তার অনেক কালের নেশা। আবার অনেক রকম পশুপাখী প্রাণীর ডাক ডাকতে পারে চমৎকার। নাটকে এসব ডাকের জন্য কতবার সে উপস্থিত থেকে প্রয়োজন মিটিয়েছে এপাড়া ওপাড়ার। তবে দু'টো জিনিস তার ঘণ্টায় ঘণ্টায় চাই—পান আর চা। চায়ের অভাব হলেও কিছু এসে যায় না কিন্তু পানের অভাব হলে শৈলেশদা মধ্যে মধ্যে উধাও হয়ে যাবে কাউকে কিছু না বলেই। খেয়াল হলে খানিক বাদে পান খেয়ে এসে আবার কাজ ধরবে—নতুবা সেদিনের মতো উধাও হয়ে যাবে। ধরে আনতে হবে খুঁজে। দেখা যাবে অন্যপাড়ার কাজে, সাহায্যে সে নেমে পড়েছে। ডাকলে জিব কেটে বলবে, 'এই রে, একেবারে ভুলে গেছি। এই ছেলেগুলো ডাকলো, তাই ওদের স্টেজটা তৈরী করে দিচ্ছিলাম। আচ্ছা যাও, আমি যাচ্ছি এখনই. এই বলে ছোটদের কাজটা প্রায় শেষ ক'রে দু'একজনকে বাকীটুকু করবার নির্দেশ দিয়ে সেখানে রওনা হয়।'

সবরকম কাজে দক্ষ এমন মানুষকে সবাই চায়। ঠেকায় পড়লে বাড়ি বা পথ থেকে তাকে ধরে আনতে পারলেই হ'ল। তবে কাজে সব সময় তার মন হয় না। মন হল তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে চলল। আর মন না হল তো শত অনুনয়েও কোন কাজ হবে না। বাড়িতে দীর্ঘদিনের শয্যাশায়ী মায়ের সব কাজ তাঁকেই করতে হয়। এ ব্যাপারে অন্যের সাহায্য কমই পাওয়া যায়। একই বাড়িতে তার বড়, মেজ ভাইয়ের সংসার চলছে পৃথকভাবে। এক অবিবাহিত বোনও থাকে পৃথকভাবে। মায়ের সেবার কাজে নিতান্ত ঠেকায় পড়লে এদের সাহায্য পাওয়া যায় অল্প সময়ের জন্য। কাজেই শৈলেশের বাড়ি থেকে বেরোবার সুযোগ নেই। বি. এ. পড়তে

পড়তেই তাব পড়া বন্ধ হল মাযেব জন্য। এল আই সি, পিযাবলেস ও আবো দু এক সংস্থায কাজ কবেছে কিছুদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই তাব পক্ষে বজায বাখা সম্ভব হয নি। প্রাথমিক বিদ্যালযে চাকবীব চেষ্টাও সে কবেছে। কিন্তু কিছুই সে জোটাতে পাবে নি। মধ্যে দু'বাব ব্যবসাযেব চেষ্টাও কবেছিল। সফল হয নি। ছোট ভাই থাকে দিল্লী। সবকাবী সেচ বিভাগেব ইঞ্জিনীযাব। তাব পাঠানো টাকাতেই শৈলেশ মাযেব ওষুধ-পথ্য, অন্নসংস্থান ও বিদ্যুতেব ব্যয নির্বাহ কবে। মধ্যে মধ্যে টাকাতেও টান পড়ে। নানা কাবণে টাকা আসতে বিলম্ব হলে ওকেই আত্মীযবন্ধুব সাহায্য নিয়ে সামগ্রিক প্রযোজন মেটাতে হয।



শৈলেশের এত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সে আজও কোনো কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না দেখে এ অঞ্চলেব সকলেবই পরিতাপ বয়ে গেছে। ওকে ভালবাসে সবাই— শৈলেশও ছোট বড় সবাইকে ভালবাসে। সবাই ওর বন্ধু। ওর বন্ধুবান্ধবদের নানাদিকে কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের খবর দিযেছে আমাকে। সেই সঙ্গে মুহূর্তের জন্য ব্যক্ত হয়েছে নিজের অসাফল্যের ক্ষোভও। ওর বিবরণ শুনতে শুনতে মনটা বিষণ্ণতায় ভরে যায। চল্লিশ পেরিয়ে আজও শৈলেশ সমান তাজা। পথ চলতে

সকলের শৈলেশদা চিরদিনই মজা করে। কখনও পাখীর ডাক ডেকে এক শিশুকে চমকে দিয়ে তার সঙ্গে আলাপ জমায়। কুকুরের ডাক ডেকে পথের কুকুরকেও চমকে দিয়েছে সে অনেকবার। কোনও বাড়িতে শিশুকে হয়ত কিছুতেই দুধ বা ভাত খাওয়ান যাচ্ছে না। শৈলেশদা বারান্দায় ঐ দৃশ্য দেখেই কোলা ব্যাঙের ডাক ডেকে অঙ্গভঙ্গী করে ছড়া-গান গেয়ে তাকে এমন ঠাণ্ডা করে দিল যে সে শান্ত হয়ে সব খেয়ে নিল। এমন ঘটতেও দেখেছি, শৈলেশ দাদার নাম ক'রে মায়েরা দিব্যি দুধ-ভাত সব খাইয়ে যাচ্ছে। 'ওই শৈলেশ দাদা আসছে'— বললেই শিশুর উৎসুক দৃষ্টি চারদিকে তাকে খুঁজে ফেরে। অনেক সময় রাক্ষসের কান্না কেঁদে তাকে রূপকথার গল্পও শোনাতে হয়েছে।

আকস্মিক বিপদ। ওষুধ আনার লোক পর্যন্ত নেই। শৈলেশদা এসে পড়ে ছুটে ওষুধ এনে দিয়ে গেল। বাজারের দু'একটা ভুলে-যাওয়া জিনিসও ঘরের বধূরা নিশ্চিন্তে শৈলেশদাকে আনতে দেয়।

কতবার শৈলেশদা তার ছড়া, নাটক শুনিয়ে গেছে। ছড়ার একটি বইও প্রকাশিত হবে শুনেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এ জন্য তার কোনো অনুতাপ দেখি নে। কথাটা বলা ভুল হল। সে অনুতাপের ফুরসৎ কোথায় শৈলেশের? তার সংগঠনে শৈশবে যারা বড় হয়ে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত দেশের সম্মানজনক পদে, তারা পূজার সময় বা বিশেষ ছুটিতে বারাকপুরে এলে শৈলেশদার খোঁজ করে। ওদের সঙ্গে খুশী হয় শৈলেশও। তারা অবাক হয় শৈলেশদাকে একই অবস্থায় দেখে। হাসিতে উচ্ছল। বিগত দিনের কথা বলতে বলতে এমন প্রাণচঞ্চল হয়ে পড়ে শৈলেশ যে এখনই বুঝি ওদের সে মাঠে নিয়ে গিয়ে শিক্ষণ চালাবে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাছ থেকে কাঁঠালিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের সভার দিনটিতে এক রবিবারে ১১টার মধ্যে ঐ গ্রামে যাবার জন্য রাজী করানো হয়েছে শৈলেশকে। পাড়ার বিষ্ণুদা তাগাদা দিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। ওকে শুধু সাক্ষাৎকারে একবার গিয়ে দাঁড়ালেই হবে। যোগ্যতম প্রার্থীরূপে প্রায় সকলেই ওকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক ঘণ্টা অতিরিক্ত অপেক্ষা করেও শৈলেশদাকে ওর অনুরাগী কেউই ঐ চত্বরে খুঁজে পান নি। মহকুমা শাসক, সভাধিপতি সকলের কাছেই একটু অপ্রস্তুত হতে হল। সময় উত্তীর্ণ। তাই অন্যান্যদের মধ্য থেকেই শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হল। পরে খবর পাওয়া গেল ঐদিন সকাল থেকেই মায়ের শরীর খুবই সঙ্কটজনক হয়। ডাক্তার ডাকতে হয়। ওষুধের ব্যবস্থা করতে টাকার জন্যও এদিক-ওদিক ছুটতে হয়েছিল ওকে।

দূরদর্শনের অনুষ্ঠান বা নেপথ্য শিল্পকর্মে ওর যোগ্যতা যথেষ্ট। কিন্তু এজন্য

দৌড়োদৌড়ি তো করতেই হবে। সে-সময় ও করতে পারছে না শয্যাশায়ী মাকে ফেলে।

সন্ধ্যায় সেদিন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা মাথায় নিয়ে শৈলেশদা হাজির। আমি একটু ভয় পেয়ে মায়ের খবর জানতে চাইলাম। ও বলল, মা ভালই আছেন। আমি এলাম একটা ছেলের জন্য। জয়দীপকে আপনি ভাল করেই জানেন। ওর বাবাকে নিয়ে আমি পড়েছি মুস্কিলে। নাইনের অ্যানুয়াল সামনে।

বিজ্ঞান নিয়ে দিন রাত আছে। ইংরেজী-বাংলা একেবারেই পড়ছে না। ষাণ্মাসিক খুব খারাপ করেছে। আমি বলেছি দু'একবার, ভাল টিউটর ঠিক করে দাও। তা কে শোনে কার কথা! ইংরেজী এক কোচিং-এ যায়। কিন্তু অনেক ছাত্রের ভীড়ে তেমন সুবিধে করতে পারছে না। কম ছাত্রের কোচিং বা আলাদা করে টিউটর দরকার। বাংলায় ও ভাল বলে নিজেই পড়ছে। ভাল ফল করতে গেলে বাংলার জন্যও একজনের কাছে ওর পড়া দরকার নয় কি? আমি আর কি বলি, ও তো যথেষ্ট ভেবেচিন্তে কথাগুলি বলেছে। মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিলাম। দেখেশুনে ওর উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিতে হল। শৈলেশের ভাবনা-চিন্তা দেখে আমি হতভম্ব। মা-বাপের মাথাব্যথা নেই— ভেবে মরছে ওদের শৈলেশদা। আমাকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চড়া গলায় শৈলেশ ব'লল, 'ছেলেটা একেবারে পাঁকে পড়ে যাবে। জীবনে কিস্‌সু করতে পারবে না বললাম, এক্ষুনি যদি পড়ানোর ভাল ব্যবস্থা না করে। বিকেল বেলাটায় আসতে বলেছি আমাদের এখানে। একটু খেলাধূলা—আসরের ড্রিল ব্যায়ামে থাক। তা-না, ও চলছে সাইকেল নিয়ে কোন্ বন্ধুর বাড়ি গপ্‌পো করতে। কোথায় কোন্ বখাটের সঙ্গে মিশছে বাপে খোঁজ রাখছে না। আরে বাবা, ভাল ছেলে তো কি হয়েছে? নজর রাখতে হবে না? খারাপ হতে কতক্ষণ! আপনি একদিন চলুন না মাস্টার মশায় আপনার কথা শুনবে। গিয়েছি শৈলেশের সঙ্গে ছেলেটির বাড়ি। সত্যিই তুলনা হয় না অমন ছেলের। ওর মা-বাবা শান্ত নম্র প্রকৃতির। ছেলেটি ততোধিক নম্র শান্ত। পড়াশুনায়ও ফাঁকি দেয় না। 'আমি বললাম, ও তো ঠিকমতই পড়াশুনা করছে। ভাল করবে পরীক্ষায় দেখো। টিউটর সমস্যা তো মেটানো গেছে! খবর নিয়ে জানলাম 'বিকালে কোন কোন দিন ওদের 'ফার্স্টবয়'-এর বাড়িতে পড়াশুনার প্রয়োজনেই যায়। কোন ফাঁকিবাজ বা দুষ্টু ছেলের সঙ্গে মিশছে না। মোটামুটি খবর রাখেন সবই জয়দীপের মা। উদ্বেগের কিছু নেই। তবে লক্ষ্যটা ওর বাবাকেও রাখতে হবে ওর প্রতি।

জয়দীপের বাড়ির যে কোন অনুষ্ঠানে শৈলেশই মুখ্য ভূমিকা নেয়। সব ব্যবস্থার জন্য জয়দীপের বাবা নির্ভর করেন শৈলেশের উপর। যত অসুবিধাই হোক শৈলেশও সময় ক'রে এসে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়। প্রতিটি পরীক্ষার আরম্ভে ও প্রণাম

করতে আসে শৈলেশকে। দূরে বেড়াতে যাবার আগেও একবার শৈলেশকে জয়দীপ প্রণাম করে যায়। বাড়ীতে ভাল কিছু খাবার তৈরী হলে ডাক পড়ে শৈলেশের। ওকে খাইয়ে তবে তারা খায়। এসব খবর যতই জানছি, ততই অভিভূত হচ্ছি। বাড়ছে বিস্ময়ের পরিধি। কী ভালবাসা! হৃদি-উদ্বেল এ নির্মল স্বতঃ উৎসারিত প্রেমধারা বুঝি নিজেকেও লুপ্ত করে দেবে। 'নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নীচে।' 'কী হল না, কী পেলে না, কে তব শোধে নি দেনা/সে সকলই মরীচিকা মিলাইবে পিছে।' তরুণ গগন-তলে প্রভাতের অপরূপ ছবি দেখলাম। কিন্তু এ যে পরম দান, তা কি বুঝবার শক্তি আছে? নিমেষে নিমেষে দুঃখ যায় তলিয়ে—শৈলেশ সুখে আছে না বুঝেও 'সত্যের আনন্দরূপ' নিয়ে।

দ্বাবিংশতম অধ্যায়

অঞ্জন-সুবাস চাই

ঘরে ঘরে ধূপ চাই, অন্ধ বন্ধু ভাই পাই—নিয়ে যান লক্ষ্মীপূজার ধূপ—ভক্তি-মেশানো ধূপ— সোনারপুর রেল-স্টেশনের প্রবেশপথে একটি বড় দোকানের কোণে একটি মোড়ায় বসে সকাল-বিকেল দু'বেলাই এই পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। শুধু এবারের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় নয়—নিত্যই তাকে এখানে দেখা যাবে সপ্তাহে একটি দিন বাদে। ঐ দিনটিতে তাকে যেসব কাজ করতে হয় সেগুলি হল—জামা-কাপড় কাচা, ধূপকাঠি তৈরীর সরঞ্জাম ক্রয়, কিছু কিছু বাড়ি থেকে মাসকাবারী টাকা আদায়।

দশ-বারো বছর ধরে এই একই দৃশ্য দেখছি। পরণে ফুলপ্যান্ট সার্ট— মাঝে মাঝে ধুতীর সঙ্গেও সার্ট পরতে দেখেছি। হাতে সব সময়ই একটি লাঠি। ঝোলানো কাপড়ের সাইড্ব্যাগ। এর মধ্যে বেশ কিছু ধূপকাঠির প্যাকেট অতি সাধারণ পাতলা কাগজে মোড়া।

অনেকদিনই ভেবেছি এই মানুষটির সঙ্গে একটু পরিচিত হব। সুযোগ হয়ে ওঠে নি। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে দেখছি কাজ অনেক বেড়ে গেছে। কাল শিবরাত্রি, আজ একটু সময় আছে। দু-প্যাকেট ধূপকাঠি চাইতেই খুশীতে উচ্ছল।

—নিয়ে যান খুব সুন্দর—দামী সেন্ট্।

—আপনি সোনারপুরেই থাকেন?

—হ্যাঁ, সূর্যনগর—স্কুলের কাছেই ঘর।

—আপনার নামটা?

—অঞ্জন সরকার। আপনি চেনেন না? সবাই চিনে আমারে—একটু হেসে উত্তর দেন সবিনয়ে।

আমার বাসস্থানের খবর নিয়ে বলেন—'আপনি রেল লাইনের অপরপারে থাকেন, তাই জানেন না।'

সংসারে কে কে আছেন জিজ্ঞাসা করতেই জানালেন দুই ভাই ও কাকা রয়েছে —একই বাড়িতে পাশাপাশি বসবাস হলেও সংসার পৃথক। বৃদ্ধা মা আছেন। বিস্মিত হলাম। একা কীভাবে অন্ধ হয়েও সংসারের সব কাজ করেন তাই ভাবছিলাম। এক

বিধবা বোন মধ্যে মধ্যে এসে তার কাছে থাকেন। এলে তিনি দু'তিন মাস কাটিয়ে যান। নিজের পয়সায় বাজার করে এনে রেঁধে বেড়ে ভাইকে খাইয়ে-দাইয়ে একটু শান্তি পাবার জন্যই আসেন।

বড় ভাই ওকালতি করেন পাটনাতে। ছোট ভাই বাংলাদেশের পৈতৃক ভিটাতে বাস করছেন, তার কর্মস্থলও ঐ ফরিদপুরেই। বড় ভাই-এর পরিবার পাটনাতে। দীর্ঘকাল পাটনাতে অবস্থান করলেও ছোট ভাই অশেষের এক ছেলে, এক মেয়ে এখানেই পড়াশুনা করছে। মাসে একবার এদেশে এসে দেখাশুনা করে। আগ্রহভরে অঞ্জন জানায়—'আমারেই দ্যাখ্‌তে লাগে। আপনাগো আশীব্বাদে পড়াশুনায় ভাল। ছেইল্যা ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। এইবার এইট কেলাস হইব। আর মাইয়া ছয় কেলাসে উঠ্‌ব।'

অঞ্জনের নিজের সংসার বলতে এরা সবাই। মায়ের স্নেহ অঞ্জনের প্রতি একটু বেশী—বিশেষ করে কৈশোরে একটি ঘটনায় অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে মা তো প্রতিটি মুহূর্তে ওকে চোখে চোখে রাখতে চান। অঞ্জনও মাকে খুব ভক্তি করে। প্রায়ই মায়ের জন্য কিছু ফল, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে যায়। ওর সাধ্য অল্প হলেও কর্তব্যবোধ সবার উপরে।

রবি-সোম দু'দিন ছুটি আছে দেখে অঞ্জন ভোরবেলা থেকে ধূপকাঠি তৈরীর কাজে লেগে গেছে। সুধীর মাস্টার গিয়ে দেখেন ভাইপো-ভাইঝিকে সমানে বকাবকি কবছে অঞ্জন—'আর না, আর না—এইবার যাও—পড়া কর গিয়া। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমার কাম শ্যাষ হইব। সাতটায় ঠিক বাজার ধইরবার পারুম।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা পড়তে চলে গেল। সুধীরবাবু দেশের বাসন্তী পূজার জন্য একশ প্যাকেট বিশেষ ধূপকাঠির কথা বলতে এসেছিলেন। সামনের সপ্তাহে দেশে পাঠাতে চান। অঞ্জন এগিয়ে এসে নমস্কার করে জানায়—চিন্তা নাই, ঠিক সময়ের দুইদিন আগেই পাইবেন।

সুধীরবাবু সেদিন তার বন্ধু রমেশবাবুকে বলছিলেন ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে ত নয়, নিজের ছেলে-মেয়েই যেন ওর। নিজে অমানুষিক পরিশ্রম করে এই কারবার গড়ে তুলেছে। অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও রেখেছে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়ে ও যে সংসার রচনা করেছে উচ্চ-শিক্ষিত বহু মানুষও তা করতে পারেননি। মধ্যে মধ্যে ওর খুব দুর্দিন গেছে। বর্ষা এত বেশী হয়েছে যে ওর আয় চার মাস প্রায় শূন্য। ধূপকাঠি শুকাতে রৌদ্রই ওর ভরসা। তাই ঐ সময়টা ওর পক্ষে দুর্দিন। পুঁজি আর লোকবল থাকলে শীত-গ্রীষ্মে বেশী উৎপাদনের ব্যবস্থা ও করতে পারত। কিন্তু কোনটাই যে ওর নেই। মাইনে দিয়ে লোক রাখতে গেলে লাভের অঙ্ক অর্ধেকে

নেমে যাবে। তাই ও নিজেই দিনরাত খাটে। স্কুল ছুটি থাকলেই ছেলে-মেয়ে দুটি ছুটে এসে কাজে হাত লাগায়। কিন্তু একটু কাজ করতেই কাকার বকুনি খেয়ে পড়তে চলে যায়।

রবিবাব থলি হাতে বাজারে বেরিয়েছি। হাতে সময় আছে। অঞ্জনের একটু খোঁজ নেওয়া যাক। নির্দিষ্টস্থানে আজ আর সে বসে নেই। এদিক-ওদিক লাঠিটা হাতে নিয়ে চীৎকার দিয়ে চলেছে—প্রাণের ঠাকুর কোথায় নাই? এই অন্ধের ধূপ চাই। —ঘরে ঘরে ধূপ চাই, অন্ধ বন্ধু ভাই পাই।

কাছে এসে হাতটি ধরে বললাম, 'দু'প্যাকেট ধূপ চাই'। খুশী হয়ে এগিয়ে দিতেই প্রশ্ন করি আজ ঘুরে ঘুরে বিক্রী কেন? ও জানাল মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে বিক্রী করে, তাতে দু'দিকেরই সুবিধা। একটানা বসে থাকার জড়তা থেকে মুক্তি, আবার বিক্রীও একটু বেশী।

দু'বছর বাদে একদিন হঠাৎ দেখা অঞ্জনের সঙ্গে পোস্ট-অফিসে। চেহারা অনেকটাই খারাপ মনে হল। বছরখানেক আগে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। মায়েব জন্যই এতদিন ওকে খাটতে হয়েছে। সেবা-যত্নের কাজ এখন আর তাকে করতে হয় না। ওর আদরের ভাইপোটি এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। মেয়েটি পড়ে এইটে। ছেলেটিকে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে বড় ইস্কুলে। 'ও ঠিক ইঞ্জিনীয়ার হইব দেইখেন, কইলাম। মাথাডা ভাল'— অঞ্জন সগর্বে ঘোষণা করে। কোথায় কাকে কার কাছে পড়াতে হবে, অ্যাডমিট্ কার্ড



ঘরে ঘরে ধূপ চাই।

মার্কশীট্ কবে আনতে হবে, কবে টাকা জমা দিতে হবে— সব খোঁজ ও রাখে।

'তোমার ধূপকাঠির কারখানা কেমন চলছে?' জানতে চাই। মাথাটা একটু নীচু করে কী ভাবল যেন। তারপর মুখ তুলে মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'মন্‌ডা থির অইল কৈ? যার সেবা করুম্, হেই চইল্যা গেল, হব্ কাম্ মনের দুঃখে দিলাম ছাইড়্যা। ছয় মাস হৈল আবার আরম্ভ করছি। আগের মত নাই— দেহি কতডা পারি। আশীব্বাদ কইরেন, ছেইল্যা, মাইয়াডারে যেন এট্টু মানুষ করতে পারি।'

জীবনের পথ মসৃণ নয়। তবু সেই পথের কঠোরতা একটু কমবে ব'লে মানুষ আশা করে। আরাধ্য দেবতাকে সে ডাকে। তাই মনের এ জোর তার থাকে। কিন্তু এক এক সময় বিধাতা সে হিসাব এলোমেলো করে দেন।

জীবনের সর্বস্ব সমর্পণ করেও অঞ্জনের শেষ আশাটুকু বুঝি এবার বিফল হয়। ওর দুশ্চিন্তা বেড়েই চলে। দীপ আর আলো না চাইলেও বন্দনা ওদের কিছুকাল হল চাল-চলনে একটু আধুনিক করে তুলবার চেষ্টা করছে। ওরা অঞ্জনের পছন্দমত পোশাক পরুক—এটা সে আর এখন সহ্য করতে চায় না। তার যুক্তি আজকাল একটু পাশ্চাত্য চালচলন না থাকলে কোথাও ঠাঁই হবে না। এখন থেকে তাই বন্দনা ওদের আপ্-টু-ডেট্ করে তুলতে চায়।

অঞ্জন অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। এতদিন তো বন্দনা এভাবে কথা বলে নি। সন্দেহ জাগে তার মনে। তবে কি সে ভুল করছে? কিন্তু এসব পোশাক তো সে দেখছে অভিজাত কিছু পরিবারের ছেলেমেয়েদের ব্যবহার করতে। দীপ আর আলো সুযোগ খুঁজে তাঁদের অঞ্জন-জ্যেঠুর কাছে চলে আসে। অনেক কষ্টে অঞ্জনকে দ্রুত চুপিচুপি নিজেদের ঘরে পাঠাতে হয়। ইচ্ছা থাকলেও অঞ্জন কিছু দিতে পারে না ওদের হাতে। শুধু কিছু খাবার দেয় ঘরে এনে। তাও মধ্যে মধ্যে ধরা পড়ে গেলে ওদের মায়ের বকুনি শোনে ঝাঁঝালো কণ্ঠে।

পায়ে ব্যথার জন্য অঞ্জন বেশীদূরে যেতে পারে না। অন্যদের সাহায্য নিয়ে কেনাকাটাও মধ্যে মধ্যে করতে হয়। সাতমাস বাদে একদিন সকালে স্টেশনের কাছে গিয়ে দেখি সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—লাঠিখানা কোলের কাছে রাখা। একটি পলিথিনের টুলের পরে বসে মাথাটা একটু নীচু করে হাঁকছে—'অঞ্জন-সুবাস পাই। ঘরে ঘরে ধূপ চাই।' কাছে গিয়ে ডান হাতটা ধরে বলি, ধূপ দাও তিন প্যাকেট। 'পাঁচ প্যাকেট নিলে একটা ফ্রি পাইবেন।' তেমন প্রয়োজন না থাকলেও ওর অনুরোধ রাখতে হল। আমার খোঁজ-খবর নেবার পর নিজের কথা বলে—

'যেমন তেমন একখানা ঘর ভাড়া পাইলে আমি বাড়ি ছাইড়্যা আইমু। আর থাকন যায় না, কত্তা। একটু নীরব থেকে বলি 'দীপ, আলোকে ছেড়ে থাকতে পারবেন?'

—হ, হ, পারুম্ কত্তা, অখন সবই সইতে পারি।

গলা ধরে আসে ওর। কান্নায় ভেঙে পড়ে। জানলাম এখন পড়াবার সব ব্যবস্থাই বন্দনা নিজের হাতে করে। খাওয়া-পরা সবই চলছে ওর পছন্দমত। অঞ্জনের কাছে আসতেই দেয় না বন্দনা। লুকিয়ে ক্বচিৎ আসতে পারে।

নিজের হাতে সব করতে পারে না। তাই ওর সঙ্গে থেকে ছায়া নামে একটি ছোটো মেয়ে ধূপকাঠি বিক্রী করে। খাওয়া থাকা ওর কাছে। তিন মাস হল আছে। মেয়েটিকে সকালে স্কুলেও পাঠায়। রান্নার কাজও, যা পারে করে। বুঝলাম ছায়াই ওর সম্বল। মাঝে মাঝে এখনও বিধবা বোনটি এসে কিছুদিন থেকে যায়। এভাবে চললেও হয়ত চালিয়ে নিত অঞ্জন। মাসখানেক আগে সে ওদের জন্য পূজার জামা-কাপড় দিতে গেলে মুখের পরে বন্দনা বলে দিল 'ও-সব ওরা পরবে না, আপনি কেন এনেছেন?' দীপ-আলো খুবই কান্নাকাটি করেছিল। ক্রোধভরে বন্দনা সেদিন ওদের ঘরে টেনে নিয়ে গেল। নির্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল অঞ্জন।

সহৃদয় মাধব দেবরায়ের বারান্দার স্টেশনারী দোকান ঘরটির পাশে একটা কোণ ঘিরে নিয়ে সাময়িকভাবে অঞ্জন রয়েছে অন্ধের যষ্টি ঐ ছায়াকে নিয়ে। সন্ধ্যায় ওর মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঘরে থাকতে পারে না। মনে পড়ে যায় দীপ, আলোর কথা। সন্ধ্যার দীপ জ্বালা হতেই ও পাশের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনে সেখানে গিয়ে বসে। প্রায় এক ঘণ্টা শোনে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে ফেরে।

মন্দির থেকে ফেরার পথেই দেখা হয়ে গেল অঞ্জনের সঙ্গে। বহুদিন পর দেখা। ওর ডান হাতে লাঠিটা। কাঁধের ঝোলাটি এখন দেখছি না। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ভয়ে ভয়ে কেমন আছ প্রশ্ন করতেই স্মিত হাসির রেখা টেনে সহজ উত্তর 'ভাল আছি, ভাই।' আপনি ভাল?'

আমিও জানাই 'ভাল আছি।' কথা বলতে বলতে অনেক দূর চলে এসেছি। ওর প্রস্তাব 'চলেন না, দেইখ্যা আইবেন আমার নতুন বাসা। বারান্দার একটি কোণ প্লাস্টিকের চট্ দিয়ে ঘেরা। মেঝেতে পাতা মাদুরটিতে বসি। ছোট্ট মেয়েটি চা করে আনল। সঙ্গে একটি বাটিতে মুড়ি। ঘরের মেঝেতে বিছান অনেক ধূপকাঠি। আনন্দ-উজ্জ্বল দিনগুলির কথা কত উৎসাহভরে বলে। আমার হাত দুটি ধরে জানায়—অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনের। আইবেন সময় পাইলে। শান্তি পাই আপ্নেরে কথা কইয়া।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসি। নিজের ঘর ছেড়ে এক চিল্‌তে বারান্দার কোণটুকুতেই ওর কারখানা, ওঠা-বসা-শোওয়া সব। দু'শ টাকা ভাড়া। তবে অঞ্জনের জন্য মাত্র একশ টাকা। অঞ্জন জানায়—'সুধীরবাবু আমারে খুব ভালবাসেন—

'কি, কমু তার দয়ার শরীলডার কথা। আমার বিক্রি-বাটা তেমুন নাই দেইখ্যা তিন মাস হৈল ভাড়া ন্যান্ না। এমুন মানুষ আমার ভাইগ্যে আছিল কত্তা! ভাবতে পারি নাই। মস্ত বিদ্বান, ধার্মিক হইলেও মাটির মানুষ, কোন দেমাক নাই।'

এরপর তার কথা সেদিনের মত থামিয়ে ফিরতে হয়েছিল। সুধীরবাবুর বাড়ির সকলের কথা একে একে বলতে শুরু করে কৃতজ্ঞতায় তার দু'চোখ ভরে আসে জলে।

মায়ের মৃত্যুর পর অঞ্জনের অবলম্বন হতে পারত দীপ আর আলো। কিন্তু ওর চোখের আলো নিভে যাবার পর অন্তরের আলো ওবা জ্বালিয়ে রাখতে পারল কই? বিধাতা ওর শেষ সম্বলটুকু বুঝি কেড়ে নিলেন! যে শান্তি, সুখ মানুষ জীবনে পাবার আশা করে, মনের অগোচরে হলেও তা যে বন্ধন! মায়ার সে বন্ধন ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি কোথায়? নয়নের আলো কেড়ে, সংসারের স্নেহ-মায়ার বন্ধনটুকু ছিন্ন করে বিধাতা বুঝি এবার তাকে চিরসুখী করতে চান। পথের ধারের কোন ঘর থেকে যেন একটি মেয়ের গলায় সুর ভেসে এল—'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহি রে'।

ত্রয়োবিংশতম অধ্যায়

নিত্যপ্রিয়

ভোরের এক টুকরো আলো ফুটতে না ফুটতেই বৈরাগী এসে গান গেয়ে চলে গেছে। কতবার তাকে দেখবার চেষ্টা করেছি। ঘুম ছেড়ে বাইরে আসতে আসতে সে উধাও। কখনো নন্দরাণী তাঁর আদরের গোপালকে জাগাবার চেষ্টা করছেন। কখনো বা গোপাল নানা বায়নায় মাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন। বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, গানের সুর বলছে ওঠ, পথ চলতে হবে—সময় বয়ে যায়। অস্পষ্ট মনে পড়ছে কিছু কথা—

ভোর ভয়ি, যশোমতী বোলয়ে—
উঠত নন্দলাল।
ব্যানাপ্রভাতকালে কোকিল বোলয়ে যায়ে,
উঠত মেরে গোপাল।

গান গেয়ে পথ চলেন যাঁরা, তাদের গান আমাকে জাগিয়ে দেয। উদাত্ত পুরুষ-কণ্ঠে ভোরবেলায় রবীন্দ্রসংগীত শুনেছি। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষটিকে দেখবার যতবারই আয়োজন করেছি, দেখা মেলেনি। গান শুনেছি রাত্রির অন্ধকারে গ্রামের হাট থেকে ফেরা মানুষের কণ্ঠে। গভীর রাত্রেও করুণ সুরে কিছু হারাবার বেদনা হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান প্রকৃতিলোকের ছবিকে দেখার দৃষ্টি দান করে; অসীম অরূপকে উপলব্ধির নেশা জাগায় ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে।

পথ চলা যে এত কঠিন এতদিন তা বুঝতে পারিনি। হিমালয়ের কোলে টাইগারহিল বা কেদারবদরীর পথ কঠিন হলেও তা অতিক্রম করা গেছে। কিন্তু জীবনের পথচলা, সে তো অবিরাম বাধায় পূর্ণ। গানটি আজ ভাবিয়ে তুলল—

যেতে যেতে চায় না যেতে, ফিরে ফিরে চায়—
সবাই মিলে পথে চলা হল আমার দায় গো।

বাঁধনকে 'সাবধান' করলে 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন' কেমন করে হবে? সৌন্দর্য ধাঁধাঁ লাগায়, তাই অধিকক্ষণ তাকে নিয়েও থাকা চলে না। সেখানেও বন্ধন। একমাত্র

'কেবল চলা'-তে বন্ধনের ভয়টা নেই। কেননা চোখ যা দেখছে, তা কেবলই ছেড়ে চলে গেছে, তাঁদের সবার চলাটাই সত্য। তাঁরা দেখা দেয়নি, কেননা তাহলে ঐ থামাটা হ'ত মৃত্যু বা মিথ্যা। জীবনপথে চলতে এই মিথ্যার বন্ধনও যে রমণীয়। তাই কবি গেয়েছেন—

জানি হ'ল যাবার আয়োজন,
তবু পথিক থামো কিছুক্ষণ।

পথিক কিছুক্ষণের জন্যই থামে। জীবনটাকে এই 'কিছুক্ষণ' করে তুলতে পেরেছেন নিত্যপ্রিয়বাবু। দীর্ঘদেহী অবসরপ্রাপ্ত চিরকুমার মিলিটারীম্যান। বাড়িতে এখন শুধু বৃদ্ধা বিধবা মা আর তিনি। সদাহাস্যময় নিত্যপ্রিয়দা বিবেকানন্দ পরিষদের কাজ করছেন পনেরো বছর ধরে। এখন আরো আছে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, অভেদানন্দ মিশন, হিন্দু-মিলন মন্দির ইত্যাদি। নববারাকপুরের এই মানুষটিকে এক ডাকে সবাই চেনে। হাত-পা ভেঙেছে। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানা বা



নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে— লোক পাওয়া যাচ্ছে না? খোঁজ কর নিত্যপ্রিয়দাকে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তার সেবার মধ্যে সবাই বল, ভরসা খুঁজে পায়। ঐ হাসিমুখটি দেখলেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কমে। এই তো সেদিন বৃদ্ধ পৃথ্বীশবাবুকে চোখের চিকিৎসার জন্য বারাকপুরের 'দিশা'তে নিয়ে গেলেন। শল্য চিকিৎসার পর গাড়ি করে বাড়ির একজনের সঙ্গে গৃহে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমার দুটি মূল্যবান বইয়ের প্রয়োজন। কোলকাতা যাবার সময় পাচ্ছি না। নিত্যপ্রিয়ের শরণ নিতেই নাগালে এল বই। কয়েকটা জরুরী চিঠি পৌঁছে দিতে হবে। হিমসিম খাচ্ছি—সময় হচ্ছে না। লোক পাচ্ছি না হাতের কাছে যাকে বলব পৌঁছে দিতে। এমন সময় নিত্যপ্রিয়ের আবির্ভাব। দ্রুত সমাধান হয়ে গেল সমস্যার।

কেরোসিন ফুরিয়েছে। বাড়িতে এসেছেন কয়েকজন। তাদের ফেলে তেল আনতে যেতে পারছি না। এমন সময় নিত্যপ্রিয় এসেছেন আমাকে একটা চিঠি দিতে। নিজে থেকেই ছুটলেন পাত্র নিয়ে তেল আনতে। তেল এনে দিয়ে যাবার আগে বলে গেলেন—আমাকে বলবেন, যখন যা অসুবিধা হয়। কাজ করে আমি সুখ পাই দাদা, এই একটু মানুষের সেবা—আর তো কিছু করতে পাবি না— সামর্থ্য, কোথায়?

নিত্যপ্রিয়কে নানা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে দেখেছি। কিছুক্ষণ যোগ দিয়েই চলে যান। আরো দু'একটি জায়গায় অপরের সেবায় থাকতে হবে। কথা দিয়েছেন যেখানে যেখানে, সেসব জায়গায় সময়মত পৌঁছতেই হবে। বিস্মিত হয়ে এক একদিন প্রশ্ন করেছি 'আচ্ছা নিত্যপ্রিয়বাবু, আপনি বিশ্রাম নেন কখন? সর্বদাই ছুটছেন আপনার কাজ তো কোনকালেই ফুরাবে না।

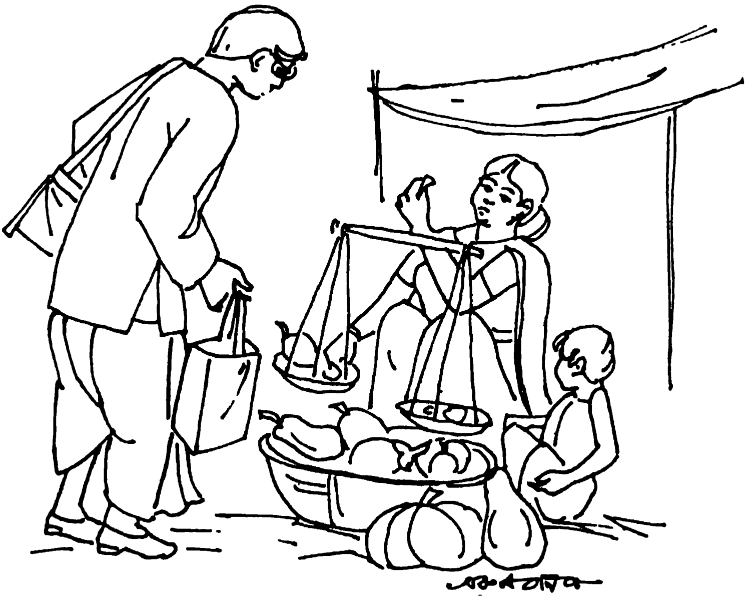
নিত্যপ্রিয় একটু হেসে উত্তর দিয়েছেন, 'ঠিক বলেছেন। কাজ না থাকলেই যত দুশ্চিন্তা আমার মাথায় এসে কিল্‌বিল্‌ করে। আর এই কাজ আছে বলেই সে-সব পালায়। কত আনন্দ বলুন তো! সবার মুখের হাসিটি দেখি।'

এমন হিতৈষী মানুষটিকে কিছু দিতে চায় প্রাণ। কিন্তু কিছু নিতে চান না নিত্যপ্রিয়। আহারাদির ক্ষেত্রেও ভালোমন্দ কিছু দিতে গেলে সামান্যই গ্রহণ করেন। কাজ শেষ হলে আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। আমরা একটু গল্প করতে বসলে উনি দু'মিনিট বসেই উঠে পড়েন। দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করে 'কেমন আছেন'? হাসিমুখে উত্তর 'খুব ভাল।' বয়স সত্তর অতিক্রম করেছে। এখনও দৌড়ে বেড়ান দুবেলা। বেশীক্ষণ কোথাও নিত্যপ্রিয়ের দাঁড়াবার উপায় নেই। অনেক কাজ পড়ে আছে তাঁর। নিঃস্বার্থ এমন পুরুষ নিত্যই সবার প্রিয়—তাই কি তিনি নিত্যপ্রিয়?

চতুর্বিংশতম অধ্যায়

শৈলবালার সংসার

শহরপুরের শৈলবালাকে সকলেই চেনে। বিশেষ করে পবাণচন্দ্র দে যখন সাতচল্লিশ বছর বয়সে দুই নাবালক পুত্র ও এক শিশুকন্যা সহ শৈলবালাকে রেখে আকস্মিকভাবেই অন্তিম যাত্রা করলেন, তখন শহরপুর গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়েছিল এ বাড়িতে। ব্যবসায়ী মহলে এমন সৎ সদাশয় মানুষ বিরল। প্রতিবেশীর বিপদ-আপদে সর্বদাই ছুটে আসতে দেখা গেছে তাঁকে। কর্তব্যভার নিজেই জুটিয়ে নিতেন। আবার ব্যবস্থা হয়ে যেতেই তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। সাজিরহাটের কাপড়ের সে দোকান আর রক্ষা করা গেল না। শিশুসন্তান নিয়ে দিনকতক দোকান সামলেছিলেন শৈলবালা। কিন্তু তিনটি সন্তানের পড়াশুনা দেখাশুনার ব্যবস্থা করতে গিয়ে খুবই অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল দোকান খোলা। ক্রমে খদ্দের গেল কমে। পড়াশুনার খরচ জোটাতে পুঁজিতে পড়ল টান। দোকান রইল পড়ে। বছর চারেক



বাদে অল্প পুঁজি সম্বল করে সাজিরহাটে এক সব্জী-দোকান খুলে বসলেন শৈলবালা। কাঁচা বাজারে কাঁচা পয়সা। মোটামুটি ভালই চলতে লাগল। সকলকে অবাক করে তিনটি সন্তানেরই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে সে আজও। বড় ছেলে শ্যামল বি.কম. পাশ করে কোথায় যেন কী শিখছে। ছাত্র পড়িয়ে কিছু উপার্জন করে। মেজ রতন আর কন্যা পিয়ালী ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। দুই পুত্র টিউটরের কাছে পড়ে। কন্যার পড়াশুনা দেখে বাড়ির সকলেই।

বরানগর থেকে সোদপুর হয়ে অটোরিক্সায় নেমে কিছু সব্জী ও কাঁচা আম কিনছি এক মহিলার দোকান থেকে। হঠাৎ কোথা থেকে সাইকেল রেখে পায়ে হাত রেখে প্রণাম করছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করার আগেই শৈলবালা হেসে একটু গর্বের সঙ্গেই বলেন, ''আমাগো বড় পোলা।'' মুখটি পরিচিত। মনে পড়ল ছাত্র ছিল বটে। বেশ সপ্রতিভ, নম্র। ওদের স্কুলে পড়ার সময়ের প্রথম সারির দু-চার জনের নামও বলল। শ্যামলের মা বারবার হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে সংসারের কিছু কথা জানালেন। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যুর ঘটনা ও তার পরবর্তী অসহায়ত্বের কথা। এরপর থেকে ওদিকে গেলে শ্যামলের মা শৈলবালার দোকান থেকে কিছু সব্জী কিনি, ওদের কথাও কিছু শোনা হয়। একদিন একটু বেশী সময় ধবেই বিস্তৃত জানতে চাইলে তার আশ্চর্য জীবন-সংগ্রাম-বৃত্তান্ত শোনালেন। পরাণচন্দ্রের মৃত্যু খুবই আকস্মিক। আগের দিন প্রতিবেশীর এক বিবাহানুষ্ঠানে একটু দেখাশুনার খাটা-খাটনি করেছেন। তেমন অধিক আর কী? রাত দশটার মধ্যেই বাড়িতে চলে এসেছেন। সকাল নটায় তৈরী হচ্ছেন দোকানে যাবার জন্য। সকালের খাওয়া সেরে জামাও পরেছেন। হঠাৎ বললেন, শরীরটা দুর্বল লাগে, একটু শুই। শোবার পাঁচ'ছ মিনিটের মধ্যেই আর সাড়া নেই। ডাক্তার ডাকতে পাঠান হয়েছে। দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি এসে দেখলেন নাড়ীর স্পন্দন আর নেই। শ্বাসকষ্ট একটু দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসার সুযোগটুকুও পাওয়া গেল না।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেল। শ্যামলকে নিয়ে শৈলবালা এসে দু'বেলাই কিছুক্ষণ বসেন কাপড়ের দোকানে। দিন সাতেক বুঝে নেবার পর শ্যামল একাই এসে দোকান চালাত। কিন্তু মাসখানেক যেতেই ওর মা বললেন 'তোমার আর দোকান চালাইতে হইব না। আমি একবেলা কইর‍্যা চালাইব। তুমি পড়াশুনা ঠিকমত কর।'

মায়ের এ আদেশে প্রথমে মৃদু আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত তা মানতেই হল। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। সামনের বছরই নবম শ্রেণী হবে। তাই টিউটর ঠিক করে ফেলেছেন সপ্তাহে চারদিন গিয়ে পড়ে আসতে হবে সমীরণবাবুর কাছে। তিনি অর্ধেক টাকায় পড়াতে রাজী হয়েছেন। অর্থাৎ দু'শ টাকার জায়গায় একশ দিলেই চলবে। এই বিবেচনাটুকুতেই শৈলবালার অন্তর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। তিনি

বলেন, 'কি কমু মাস্টারমশায়, বড় দয়ার শরীল।' কথাডা কইতেই এক কথায় কইয়া দিলেন 'কাল থেকেই পাঠাও। অর্ধেক বা যা পার দিও।' যা পারি তাই কি দেওন যায়? আপ্‌নে কন। আদ্ধেক আমি ঠিক জোগাড় করতে পারুম।

ছোট ছেলে তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তার জন্যও বাড়িতে এসে পড়ান এক দিদিমণি। তাঁকে দিতে হয় পঞ্চাশ টাকা। শৈলবালা জানালেন 'রুমা দিদিমণি অন্যখানে বেশী লন, আমার থিকা খুবই কম চাইলেন, আমাদের বাড়ির সকলরে ভালবাসেন। আমাগো বাড়ির মাইয়ার মত। অসুখ-বিসুখ কিছু হইলেই ছুইট্যা আসেন। ব্যবস্থাও কিছু করেন।'

পরাণচন্দ্রের মৃত্যুর পর একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই কাপড়ের দোকানটি বন্ধ হয়ে গেল। পুঁজি ও দেখাশুনার মানুষের অভাবে দোকান বাধ্য হয়েই বন্ধ করতে হল। শৈলবালাকে দু-একজন হিতৈষিণী ভদ্রগৃহস্থ বাড়িতে রান্নার কাজ জোগাড় করে দিয়েছিলেন। বছর দুয়েক সে কাজ করার পর কিছু পয়সা জমিয়ে ঐ সব্জী-দোকান খুলে বসেছেন। এতে ঝুঁকি কম, নগদ পয়সা। ভালভাবেই চলছে দোকান। কেবল ভাল জিনিস নয়, সততা ও ব্যবহারের জন্য শৈলবালার প্রসিদ্ধি ও প্রসার। পরিশ্রম একটু করতে হয়। মালপত্র কিনে আনার কাজে মাঝে মাঝে শ্যামল সাহায্য করে। শৈলবালা বেশীরভাগ সময়েই শ্যামলকে বাড়ি পঠিয়ে নিজেই অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একত্রে মধ্যমগ্রাম হাট থেকে সব্জী এনে থাকেন। ছেলেদের বলেন, তোমরা ভাল কইর‍্যা পড়, ভাল পাশ কর, আমার জইন্য তোমাগো চিন্তা করতে হইব না।'

আটটি বছর দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হল— বৈধব্য-জীবনের একটু আঁচড়ও কারো গায়ে লাগতে দেননি তিনি। এরই মধ্যে বার চারেক ঝড়ঝাপ্টা এসেছে। আড়াই বছর পার হতেই পিয়ালী পড়ল কঠিন অসুখে। বাঁচার আশাই ছিল না। অনেক চিকিৎসার পর বাঁচল। রতন হাত ভেঙ্গে বসল সাইকেলের ধাক্কায় ছ'বছরের মাথায়। প্লাস্টার করা ছিল একুশ দিন। অর্থব্যয়ও করতে হয়েছে সাধ্যাতীত। দারিদ্র্য বার পাঁচেক আঘাত হেনেছে এ সংসারে। কিন্তু শৈলবালার সঙ্কল্প কেউ টলাতে পারেনি। ঋণ করেছেন যেমন, শোধও করেছেন একক দায়িত্বে তেমনি। প্রতিবেশিনী সুখ-দুঃখের খবর নিতে এসে পা ছড়িয়ে বসে পান খেয়ে গেছে। আর 'কেমন আছ, দিদি'র উত্তরে শুনেছে 'আপনাগো আশীর্ব্বাদে ভাই, সব ভাল।'

দুই ছেলে—মেয়ের কঠিন অসুখ সামলেছেন। ছুটোছুটি ব্যবস্থা করেছেন। হাতের দুটি চুড়ি বন্ধক রেখে টাকাও ধার করতে হয়েছে এক সময়। কিন্তু ছাড়িয়েও আনতে পেরেছেন তা।

সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছে শৈলবালার ধৈর্য, কর্মশক্তি আর কর্মনৈপুণ্য।

জিজ্ঞাসা করেছি, 'এত পরিশ্রম আপনি করেন কিভাবে?' উত্তরে বলেছেন, 'না কইর‍্যা উপায় আছিল না। গুরু-ভরসায় নামছি পর পথ পাইছি। অখন অসুবিধা হয় না আপনেগো আশীব্বাদে।

এরই মধ্যে ছেলেমেয়েদের বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা করে সন্ধ্যা বন্দনান্তে যুগবেড়িয়ার লোকনাথ বাবার মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে তার যাওয়া চাই-ই। প্রতিবেশিনী সুমনের মা মমতা ও টুটুলের মা চাঁপা তার নিত্য সঙ্গিনী। গুরু-বন্দনা, বাবা লোকনাথ-বন্দনা গান করে মিলিত ভক্তমণ্ডলী। বাদ্য কাঁসর-ঘণ্টা ধ্বনিতে নৃত্যের ভঙ্গিমায় পূজারীর এই আরতি সকলকেই মুগ্ধ করে। দূর-দূরান্ত থেকে আরতি দেখতে আসেন অনেকে। অবশেষে প্রসাদ-বিতরণে সমাপ্তি। সারাদিনের কর্ম সম্পূর্ণ করে কতক্ষণে এই মন্দিরে এসে প্রায় একটি ঘণ্টা কাটাব—এই ভাবটি সকলেরই। সেদিন মমতা বলছেন শৈলবালাকে, 'দিদি, সংসার আর সংসার!' বেরোবার আগে দুই কুটুম্ব হাজির। ছেলে আর মেয়েকে বুঝিয়ে ওদের বলে চলে এলাম। বললাম, চল না তোমরাও মন্দিরে।' ওঁরা আসতে রাজী হলেন না। কি করব বল। মনে মনে বললাম, 'থাক তোমরা ঘরে, আরাম কর। আমি মন্দিরের সময়টুকু ভাই ছাড়তে রাজী নই।'

চাঁপা সুযোগ পেয়ে যোগ করেন 'আমি ভাই কত্তাকে কইয়া দিছি, সইন্ধ্যা বেলায় লুকজনারে আইতে নিষেধ করবা। হ্যার পরও আইলে তুমি অফিস থিক্যা আগে আগে আইবা, দেখবা শুনবা। আমি আরতি দেইখ্যা তয় আইমু।'

শৈলবালা ওদের সাথে একসাথে ফিরতে ফিরতে হেসে ওঠে। দিন, মাস, বছর কত গড়িয়ে চলে। ওদের সুখ-দুঃখের কতদিনের কত কথা হয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ। ঠাকুরের কৃপায় কত অশুভ গেছে কেটে। বড় বিপদ থেকে কতবার কতভাবে রক্ষা পাবার কথা ঘুরে ফিরে আসে আলোচনায়। দুঃখের চরম দিনটিতে একে অপরের মনকে বুঝিয়েছে। ঠাকুরের প্রতি বিরূপভাব গেছে কেটে। হারায়নি কখনো ওরা নির্ভরতা। তিনজনের যেন প্রাণে প্রাণ বাঁধা। শৈলবালা ওদের দু'জনের চেয়ে প্রায় পনেরো বছরের বড়। কিন্তু অন্তরঙ্গতায় সে ব্যবধান মুহূর্তে যায় হারিয়ে। দু'জনের কিছু বিপদ ঘটলেই শৈলকে সেখানে দেখা যাবে সবার আগে। সব সামলাবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা যেন দিয়েছেন বিধাতা ওকে। সুখের দিনে শৈল যতটা কাজে উদ্যম দেখায়, দুঃখের দিনে দেখায় তার তিন গুণ। অন্যদের হটিয়ে দিয়ে কঠিন দায়িত্বগুলিই সে তুলে নেয় নিজের হাতে। কত কুসুমসাজ সে পরিয়েছে—কত কুসুম ঝরতে দেখেছে সে। দুঃখের ভার লাঘব করার কৌশল সে জানে। দুঃখের মালা গাঁথে সে দুঃখ জয় করতে।

এইতো চাঁপার ছেলেটি কঠিন অসুখে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হল, সাতদিন হয়েছে। দুশ্চিন্তায় চাঁপার মুখে, অন্ন ওঠে না। শৈল ছুটে এল কতক কাজ নিয়ে মমতাকেও সঙ্গে এনেছে। 'চাঁপা, চাঁপা' বলে হাঁক দিয়ে হকচকিয়ে দিল সবাইকে। ব্যস্ততা দেখিয়ে চাঁপাকে বলে, 'দ্যাখ্‌ছ কাণ্ড, খাওয়া হয় নাই। শীগ্‌গীর খাইয়া ল, কাম আছে জরুরী। আমারে বাঁচান লাগে। ভাল একটা অর্ডার আইছে— এক ডজন বেলাউজ আর শাড়ীতে ফেব্রিকের নক্সা করতে হইব—সাতদিন সময়। দুইটা দিন আমার এক্কেবারে নষ্ট হইল। শীগ্‌গীর খাইয়া আয়—আমরা বসি কামে।'

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে ঘরে কাপড়-চোপড় রেখে রান্নাঘরে ওর খাওয়া দেখতে এল। গল্প করতে করতে ওকে খাইয়ে নিল। চাঁপা সেদিন দিব্যি খেয়ে নিল অন্যমনস্ক হয়ে। সেদিন বেলা একটা থেকে চারটে পর্যন্ত ওরা গল্প করতে করতে কাজও করল। এমন কাজের অছিলায় দু'সপ্তাহের অর্ধেক দিনেই সে চাঁপার বাড়িতে হানা দিয়েছিল। ছেলে হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরবার দিনটিতে শৈলবালা নিজের ঘরের সব কাজ ফেলে চাঁপার বাড়িতে রইল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সব দেখে, গুছিয়ে তবে ফিরল নিজের ঘর।

পরদিন শরতেব সকালে কিছুটা পরিক্রমা করে ফিরছি। পল্লীর এক কুটীর থেকে মনে হল বেতারের সংগীতে পুরুষকণ্ঠে বিষাদের আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। আশ্চর্য, এ আনন্দাশ্রু তো আমি দেখেছি—

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজি দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথবো তোমার গলার মুক্তাহার।।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস এ মোর অহঙ্কার।।

পঞ্চবিংশতম অধ্যায়

ভগুয়ার ভাগ্য

ভগুয়াকে বারাকপুরের আনন্দপুরীর এ তল্লাটে সবাই চেনে। চল্লিশ বছর ধরে চৌধুরী বাড়ির আট-দশ জনকে শৈশব জুড়ে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়া আর ফিরিয়ে আনা—এটাই তার মুখ্য কাজ। অবশ্য সারাদিনই সে কাজ করে। বারাকপুরের এ বাড়িটির এমন ফুলের বাগানের বারো আনা কৃতিত্ব তো ভগুয়ারই। এক এক মরশুমে এক এক ফুলের বাহার মুগ্ধ করে রাখে বাড়িটির সামনে দাঁড়ালেই। তিনতলার ছাদেও অনেক ফুল হয়েছে কিছুকাল আগে। ছোটবাবু সিন্ধু জামসেদপুরে বদলী হয়ে গেলে ছাদের টবের ফুলের পরিচর্যার আর কেউ রইল না। ভগুয়া কিছুদিন রক্ষার চেষ্টা করেছিল। একা নীচের বাগান আর উপরের ছাদ—দুই সামলে উঠতে পারেনি। তাছাড়া বাহারি রকমারী ফুলের বীজ আর চারা কিনে আনার কাজ কে করবে?

ভগুয়ার বয়স সত্তর পার হয়েছে। ত্রিশ বছর বয়সে কাটীহার থেকে ওকে নিয়ে আসেন সুরঞ্জনবাবু। রেলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রূপে খুব সম্মান লাভ করেছিলেন। প্রায় দশ বছর কলকাতায় কাটিয়ে বারাকপুরের এই আনন্দপুরীতেই জমি কিনে বাড়ি করলেন। খুব দাপটের সঙ্গে এ বাড়িতে শুধু নয়, গোটা পাড়াতেই কাটিয়েছেন। নব্বইয়ের কোঠায় পা দেবার পরই বিদায় নিয়েছেন। মেজভাইও চাকরী থেকে অবসর নিয়ে এ বাড়িতেই আছেন। ছোটভাই সপরিবারে থাকেন বিদেশে। মেজ সত্যরঞ্জনের দু'টি সন্তান। কন্যা সুলোচনা এবার কলেজে বি. এ. অনার্সে ভর্তি হয়েছে। পুত্র দশম শ্রেণীতে উঠবে। এখনও ভগুয়া ওকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করছে। বার্ষিক পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। মাস খানেক বিরতির পর ওর এ কাজ আবার শুরু হবে। দেশের থেকে খবর এসেছে ওর স্ত্রী খুব অসুস্থ। ঘরে ফেরা ওর জরুরী প্রয়োজন। ভগুয়াকে মাসখানেকের জন্য দেশ থেকে ঘুরে আসতে বলছেন সত্যরঞ্জন দু'দিন ধরে। শ্রীপর্ণাও কম বলেনি।

কিন্তু ও বলে, 'মাইজী, হামি দেশে যাবে তো, আর ফিরতে না পারবে। খোকাবাবুকে তখুন্ কে ইস্কুলে দিয়ে আসবে, লিয়ে আসবে? ছে মাহিনা হামার এ কাজ তো কোর্‌তে হোবে। উস্‌কো বাদ্ মিল্‌বে ছুটি। এখন মাইজী হামার ছুটি

কুথায় ?' বলতে বলতে ওর চোখ দুটি ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে। পরণের ধুতীর এক প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মোছে। সুলোচনা তাই আর ওকে কিছু বলতে পারেন না। সত্যরঞ্জনকে ভগুয়া সেদিন বলল 'আপনার বহুৎ মেহেরবানি, রূপাইয়া তো ভেজ দিয়েছি বাবুজী, ভাই আছে—ডাগ্‌তার-বদ্যি দিখাবে। রামাজীকা কির্‌পা যো আসে—তাই মিল্‌বে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

কাটীহারের এক অখ্যাত গ্রামে ভগুয়ার পাঁচ পুরুষের বাস। একটিমাত্র কন্যা সন্তানের বিবাহের পর সে দায়মুক্তই বলা চলে। আত্মীয়-জ্ঞাতিরাই স্ত্রীর দেখাশুনা করে। সবাই কাছাকাছি আছে। মাঝে মধ্যে ভগুয়া দেশে গিয়ে একটু দেখে-শুনে আসে। কর্তব্যের ত্রুটি নেই। এবারও যখন স্ত্রীর অসুখের খবর এল, সঙ্গে সঙ্গেই ও তার করে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। উত্তরও মিলেছে। ও নিজে সেখানে বেশী হাজির হতে চায় না। দুবছর আগে গিয়ে ও আর কিছুতেই ফিরতে পারে না। আত্মীয়-জ্ঞাতি তাকে দীর্ঘদিন ধরে টানাটানি করতে লাগল। বহুদিন পরে ভগুয়াকে পেয়ে দু'চার মাইল দূরে দূরে দু'চার দিন করে সবাই রাখতে লাগল। ছাড়া পাওয়া ক্রমে মুস্কিল হয়ে উঠতে লাগল। পাশাপাশি গ্রামের সমস্যা মেটাতেও ওকে সবাই টেনে নিয়ে যায়। পরে সত্যবাবুর জরুরী তলবের কথা বলে একরকম জোর করেই চলে আসে। আসার সময় ওকে কথা দিতে হয়েছে একমাস বাদে সে আসবে।

এ অবস্থায় ভগুয়া দেশে ফিরলে সহজে শীঘ্র ফিরে আসা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। মনের ইচ্ছাটাকে রূপ দিতে ওকে যে সত্যরঞ্জনের কাছে ফিরে আসতেই হবে। খোকাবাবুকে ইস্কুলের গণ্ডী পার করে সে দেবেই। ছ মাসের জন্য সে কিছুতেই এ বাড়ি ছেড়ে দূরে যাবে না। আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় কৈশোরে দু'বছর। ছবছর বাদে আরো চার বছর ধরে দেখেছি একইভাবে একই কাজে। বিদ্যালয়ে যাবার পথে কোন কোন দিন দেখা হয়ে যেত। কারো সঙ্গে দেখা হলেই ও হাসিমুখে 'রাম কহ, শ্যাম কহ' বলে নমস্কার করত ছোট বড় সবাইকেই। ওর সঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন সতর্ক করত পথ চলতে, আমাদেরও করত তেমনি। বিকেলে ফেরার পথে কোন কোন দিন ওর দেশী হিন্দীতে রাম বা কৃষ্ণ গুণগান গাইতে দেখেছি। এখন সত্তর বছরে পৌঁছে ভগুয়ার দেহটা একটু নুয়েছে—গতি হয়েছে ধীর কিন্তু কর্তব্যের একটুও নেই বিচ্যুতি। আজও গান গায়। ওকে দেখে মনে হয় পরমের বিগলিত করুণার এক অখ্যাত নির্ঝর।

সেবার জানুয়ারীতে খোকাবাবুর দশম শ্রেণীর পড়া শুরু হল। দেখতে দেখতে দুমাস কেটে গেছে। মার্চের মাঝামাঝি দেখছি বেশ কয়েকদিন হল ভগুয়া আসছে না। বাড়ির কেউ-না-কেউ অথবা অন্য কোনও কর্মচারী খোকাবাবুকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করছে। দু'সপ্তাহ বাদে দেখি ভগুয়া আবার আসা-যাওয়া করছে। ফেরার

পথেও শুনেছি গান গায়। কর্মব্যপদেশে আমার শোনাব সুযোগ এখন কম। মাঝে-মধ্যে এক একদিন ছুটিতে থাকলে গান শুনি, ওকে দেখি। সেদিন বিকেলে ওর কণ্ঠস্বর পেয়েই বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু দূর থেকেই 'রাম কহ' বলে নমস্কাব করল। কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা কবি কেমন আছ? এতদিন কোথায ছিলে? তোমার অসুখবিসুখ করেনি তো? রামজী কা কির্পাসে আচ্ছা আসে, ভাইযা। পবে একটু ধরা-গলায় বললে, 'ভাইয়া, হামার ঘরণী হামার আগে রামজীচরণ পঁহুচ্ গেল।' কাপড়ের খুট্ দিযে চোখের জল মোছে। মুহূর্তের জন্য একটু বিহ্বল হয়। এ অবস্থায় ওকে আর প্রশ্ন করে বিব্রত করি নি। পবে জেনেছি বাড়িব টেলিগ্রাম পেয়েই ও দেশে যায। পৌঁছুবার এক ঘন্টা আগেই ওর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শেষকৃত্য এবং পারলৌকিক ক্রিয়াদি মিটিয়ে দুসপ্তাহ বাদে ও কাটীহার থেকে সত্যরঞ্জনের এখানে ফেরে। আরো একটু আগে ফিরতে চেয়েছিল, তা আর হয়ে ওঠেনি। ওখানে



ক্রিয়াকাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে নাকি খোকাবাবুর কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল বারবার। তবু ভাল আছে ভগুয়া। বাড়ির কারো অসুখ হলে ভগুয়া হয়ে ওঠে খুবই উদ্বিগ্ন। সেবা-পরিচর্যায় লেগে যায়। দিনে-রাতে ক্লান্তি নেই। দুচোখে ওর উদ্বেগ আর মমতা।

পুজোর মাসখানেক বাকী। টেস্ট পরীক্ষা আসন্ন। এমন সময়ে খোকাবাবু জ্বরে পড়ল। পাঁচদিন ধরে জ্বর ওঠানামা করছে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। দু'জন ডাক্তারের চেষ্টাতেও জ্বর থামছে না। যন্ত্রণাও মধ্যে মধ্যে বাড়ছে।

ভগুয়া কখনও ছুটছে ডাক্তারের কাছে, কখনও বা পাশে বসে কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। গা-হাত-পা টিপছে। সত্যরঞ্জন এসে দাঁড়ালেই ও তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছে বিশ্রামে। শ্রীপর্ণা দিনের বেলা দেখছেন। মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার সময় ভগুয়া তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। অথচ নিজে সে কিছুতেই খেতে যাবে না। সবার খাওয়া হলে শ্রীপর্ণা ওকে জোর করেই পাঠায় আহারে।

রাত্রি সাড়ে নটা, দশটা বাজতেই ভগুয়া সবাইকে বলে 'আপনারা শুয়ে পড়ুন, হামি বিলকুল দেখবে।' রাত জেগে ও তিনদিন পড়ে রইল খোকাবাবুর পাশে। শ্রীপর্ণা থাকতে না পেরে চতুর্থ দিন ওকে একটু কঠোর হয়েই বললেন, 'তোমাকে দিনের বেলায় অনেক কাজ করতে হয়। রোজ এভাবে রাত জাগা তোমার চলবে না। যাও, উঠে পড়। আজ তুমি ঘুমাও, আমি দেখছি খোকাকে।' এমনি করে আটদিনের মাথায় খোকাবাবুর জ্বর সারলো। ভগুয়ার এই সেবা-যত্নের প্রসঙ্গ কেউ তুললেই ও করজোড়ে মাথা নীচু করে বলে 'রাম কহ, শ্যাম কহ—রামজী শ্যামজীর কির্‌পা, বাবুজী।'

পড়াশুনায় খোকাবাবুর খানিকটা ক্ষতি হয়ে গেছে, তা নিয়ে ভগুয়ার খুব চিন্তা। সেদিন আকস্মিকভাবেই বাজার যাবার পথে দেখা হতেই বলল 'বহুৎ কষ্ট হল খোকাবাবুর, ভাইয়া। বহুৎ দিন ভী নষ্ট হল। লেকিন্‌ ভগবান কা কির্‌পা সে সব্‌ আচ্ছা মিলেগা, পরীক্ষা ভী ভাল হোবে।' ওর প্রসন্নতায় অবাক হতে হয়। আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। কিন্তু অনেক ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে ভগুয়ার শান্ত প্রসন্ন মূর্তি কী দিয়ে গড়া, তাই ভাবি।

শরতের এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। খোকাবাবু আরোগ্যলাভ করে পড়াশুনায় খুব মন দিয়েছে। ভগুয়া এখন খুব খুশী। সত্যরঞ্জনবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ বৃষ্টি। একটু ছুটবার চেষ্টা করতেই তুলসীদাসী সুর কানে এল—

সর্বসর্বগত সর্ব উরালয় বসসি হম কহুঁ পরিপালয়।
দ্বন্দ্ব বিপতি ভর ফন্দ বিভঞ্জয় হৃদি বসি রাম কাম মদ গঞ্জয়।।

সর্বব্যাপী রামচন্দ্রের বন্দনা। হৃদয়ে বাস করে কামনা অহঙ্কার দূর করার আকুল আহ্বানের সুর মনকে নাড়া দিল। ভাবলাম বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা হবে আর ভগুয়ার মুখে তুলসীদাসও একটু শোনা হবে। দেউড়ির পাশেই ওর ঘর। ঘর খোলাই ছিল। কিছু না বলেই ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনি—

সোই সচ্চিদানন্দ ঘন রামা অজ বিগ্যান রূপ বল ধামা।
ব্যাপক ব্যাপ্য অখণ্ড অনন্তা অখিল অমোঘশক্তি ভগরন্তা।।

পাঠে নিমগ্ন। তাই কথা না বলে বসি। আমার দিকে চোখ পড়তেই 'আরে ভাইয়া, রাম কহ, শ্যাম কহ—বারিশ্ লগা—ব্যস্ত হয়ে উঠে গামছা এনে মাথা মুছতে যায়। আমি নিজের হাতে নিয়ে বাধ্য হয়েই মুছি। বলি সামান্য ভিজেছি ভাই, চিন্তা করো না।

—তোমার খোকাবাবু এখন ভাল আছে তো? একটু নীচু স্বরে প্রশ্ন করতেই ওর উত্তর—'খোকাবাবু নেহি, ছোটা রামজী' ও হামার ছোটা রামজী আছে, নন্দলাল ভী আছে। তবিয়ত্ এখন আচ্ছা—দিনরাত পড়ালিখা করছে। পরীক্ষা আচ্ছা হোবে ভগবানকা আশীর্বাদ সে। রাম কহ, শ্যাম কহ ভাইয়া, সবকো কির্পা মিলে যাবে।

নিজের জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন যারা ভগুয়াকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাদের ছেড়ে আঘাত-দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও চির-প্রসন্নতায় ও আছে নিমগ্ন। জানি না, সত্যরঞ্জনের নিবাস থেকে ভগুয়ার ছুটি মিলবে কিনা? কিন্তু শত বাঁধনের মাঝেও যে ছুটি নিয়ে বসে আছে, তার কি আর নতুন করে ছুটি নিতে হবে? উত্তর মিলল বেতার-তরঙ্গে ভেসে আসা সুরে—

আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ আপনারই আবরণ।
খুলে দেখ দ্বার, অন্তরে তার আনন্দনিকেতন।

ষড়বিংশতম অধ্যায়

তরুবালার সংসার

"কি গো, তোমার ছেলের তো জয়জয়কার শুনলাম। মাধ্যমিকে এই ইস্কুলে ফার্স্ট্, কম কথা নয়"—শশাঙ্কবাবু খুশীতে ফেটে পড়েন। তরুবালা হেলাঞ্চা আর. কুলেখাড়ার দুটি বাণ্ডিল হেসে এগিয়ে দিয়ে মাথার ঘোমটা একটু টেনে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলে 'বাংলা, ইতিহাস, ভূগোলের মাস্টর দেতে পারি নাই বাবু, নইলে শ্যামল আরো ভালো কর্‌ত।'

—'তোমার ছোটটিতো সামনের বছর হাই ইস্কুলে পড়বে?' শশাঙ্কবাবু থলিতে শাকের বাণ্ডিল দুটি ভরে নিয়ে একটু দাঁড়ান। হ্যাঁ বাবু, আপনাগো আশীর্ব্বাদ থাকলে সেন পারব। এই তো দ্যাহেন, দু'গো মাস্টার অরে পড়াইতে আছে। বড় পোলা ত এক দিদিমণি থন্ যা পড়ছে— হেইয়াতেই ছান্স্ হইয়া গ্যাছে।' তরুবালা একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে।

শশাঙ্কবাবু মাথা নেড়ে সমর্থন জানান। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার মুখ ফেরান—'তোমার মেয়ে তো দুটো পাশ করেছিল। তারপর কলেজে পড়ছে তো?'

তরুবালা স্বল্প দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'পড়নের খুবই আগ্রহ আছিল অর্। কপাল মন্দ বাবু, কি করুম্ কন, কলেজের খরচ চালানের পয়সা কই আমাগো? সেলাইয়ের কাজ শিখাইছি। ঘরে বইস্যা জামা সিলাই করে। গেল বছ্ছর আর এ বছ্ছর অহন্ তাতি ভালই পাইত্যাছে। অ না আয় কর্‌লে আমি সংসার চালাইতে পারতাম না। শশাঙ্কবাবু দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দেখ সব সামলে যদি পারে পরে পড়বে। যদি পড়াও, তখন যেন আমাকে একটু জানিও।'

শশাঙ্কবাবু ভাবতে ভাবতে যান 'একটি দরিদ্র পরিবারে পড়াশুনার প্রতি কী আগ্রহ! জীবনে দাঁড়াবার আর সংসারকে দাঁড় করাবার কী জীবন-সংগ্রাম!

যুগবেড়িয়ার একপ্রান্তে বসবাস তরুবালার। টিনের চালায় মুলিবাঁশের বেড়ার দুটি ঘর। গতবছর ঘরের মেঝেটা একটু পাকা করে নিয়েছে বুদ্ধি করে। বারান্দার এক কোণে রান্নার ব্যবস্থা। লাগোয়া না হলেও পাশেই স্নানাগার ও শৌচের পাকা ঘর। পঁচিশ বছর আগে জমিতে কাঁচা ঘর করবার সময়েই বারান্দার দক্ষিণ দিকে

নলকূপ বসিয়েছে। বছর সাতেক হল টিউবওয়েলের গোড়াটা বাঁধান হয়েছে। স্নান ও কাপড় কাচারও জায়গা রয়েছে। পূবমুখো একটি তুলসী মঞ্চ। ঘরের চালে ফলন্ত লাউগাছ ছেয়ে আছে। কলপাড়ের পাশ দিয়ে পুরো উঠোনটা নিকোনো। এখানে বছরে বার তিনেক ভাগবত-কীর্তন বা গুরুসঙ্ঘের আসর বসে। ত্রিপল বাঁশের ছাউনী দেওয়া হয় টিনের চালের লাগোয়া।

শশাঙ্কবাবু কীর্তন-ভাগবত কথা ভালবাসেন। তাই তাঁর আমন্ত্রণ থাকে যখনই কোনও অনুষ্ঠান হয়। তিনিও সানন্দে যোগ দেন। এইতো গত ঝুলন পূর্ণিমার দিনটিতে কীর্তনের আসব বসেছিল। সখীগণ সহ কৃষ্ণ-রাধাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। ভক্তবৃন্দ কীর্তনান্তে প্রসাদ পেলেন ফলের সঙ্গে লুচি-তরকারী-সুজি-মিষ্টান্ন। আড়ম্বরহীন ভক্তিনিষ্ঠ এ আয়োজন শশাঙ্কবাবুর খুব ভালো লাগে। তিনি



অবাক হন, কোথা থেকে ভক্ত মহিলাবৃন্দ এসে সব সাজিয়ে গুছিয়ে ভোগের বন্দোবস্ত করছেন—বিতরণ করছেন, আবার ঝাঁটপাট দিয়ে আপন আপন গৃহে প্রস্থান। কিসের টানে এরা আসেন? ক্ষুদ্রাকারে হলেও দরিদ্র কুটীরে বার তিনেক এমন আয়োজনের অন্তর কজনের আছে? গত বছর রাসপূর্ণিমার অনুষ্ঠানের পর কৌতূহল মেটাতে প্রশ্ন না করে থাকতে পারি নি—'প্রায় হাজার টাকা করে তিনবারে তিন হাজারের বেশী ছাড়া, কম তো নয়ই—এই ব্যয়ভারে সংসারে অসুবিধা হয় না? আপনি তো ভক্তদের কাছ থেকে কিছু দান নিতে পারেন...'

শশাঙ্কবাবুর কথা কেড়ে নিয়েই তরুবালা জিব্ কেটে বলে, 'জয় নিতাই, জয় নিতাই, কী যে বলেন কত্তা, গোবিন্দ সেবাতেই তো আমার সংসারের অভাব মিটছে। নইলে এ সংসার চলত? মাইয়ার জইন্য সিলাই মেসিন, পোলা দু'জনার পড়ার খরচ—অদের বাপের আয়ে কুলাইত, কন্?' উচ্ছ্বসিত হয়ে সশব্দেই হাসিতে ফেটে পড়েন তরুবালা—একটু দম নিয়ে বলে, জানেন কত্তা, বৈকালে আর ভোরে নিতাই-গৌর আর রাধা-গোবিন্দের নাম লইয়া শাক তুলি—আঁটি বাঁধি, সাজাই।

ভাগবত-কীর্তন-সূত্র-সংযোগ না ঘটলে তরুবালার সংসারের ও তার কর্মধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন পরিচয় মিলত না। ও যে আর পাঁচজন শাক-বিক্রেত্রীর মত নয়, আচারনিষ্ঠ-গোবিন্দ-নিবেদিতপ্রাণা এক ভক্ত—একথা জানার সুযোগও হত না শশাঙ্কবাবুর। কিছুকাল ও ফুল-বেলপাতা ইত্যাদি বিক্রী করেছে। ও বলে—'গোবিন্দ সেবার ফুল কি যেমন তেমন তোলন যায়? আমার গৌর-গোপালের ভোগে লাগে শাক। মহাপ্রভুর লাইগ্যা আমার এ শাক যেমন-তেমন জাগাড় হইলে চল্বে?'

বছরে তিন হাজার টাকার এই ব্যয় যে অভাবের সংসারে নিতান্ত তুচ্ছ নয়, তা বুঝেই বিস্মিত হয়েছি। তরুবালার ভগবৎ-নিষ্ঠা-অন্তরই যে ঐ ব্যয়ে প্রেরণা যুগিয়েছে, তা বুঝেছি। কিন্তু কৌশলটি সেদিন ওর মুখে ব্যক্ত হল। হাসতে হাসতে ও বলেছিল 'গোবিন্দ সেবার ব্যবস্থা গোবিন্দই করেন। সহজেই হয়— রোজকার আয় থিক্যা আড়াই টাকা কইর্যা গোবিন্দকোটায় রাখলেই হইল।'

তরুবালা সুখে আছে। জুড়ান দাসকে সংসার নিয়ে বিশেষ ভাবতে হয় না। সামান্য কাঠের মিস্ত্রী। সবদিন কাজ পায় না। যা পায় সবটাই তরুবালার হাতে সে সমর্পণ করেই দায়িত্বমুক্ত। জুড়ান নিজের হাতখরচটা পর্যন্ত চেয়ে নেয় ওর কাছে।

পনেরো-ষোলো বছর হল তরুবালার কাছ থেকে শশাঙ্কবাবু শাক ক্রয় করছেন। সপ্তাহে চার-পাঁচ দিনই তাকে শাক কিনতে হয়।

তরুবালার কন্যা সুলোচনার অনেক গুণ। আর তার গুণের ব্যাখ্যা তরুবালা কখনই শেষ করতে পারে না। অন্য কথা বলে ওকে থামাতে হয়। এখন তার একমাত্র ভাবনা কন্যার বিবাহ। পাত্র জোগাড়ের ভার সে খানিকটা শশাঙ্কবাবুর উপরও চাপিয়েছে। তার অনুরোধ—কায়স্থ কুলের শিক্ষক হলে সবচেয়ে ভাল হয়। ওরা কায়স্থ বলেই কায়স্থ পাত্র ওদের একনম্বর পছন্দ।

তরুবালার নিজের সোনার গয়নার খানিকটা রয়েছে মেয়ের জন্য। সেইসঙ্গে এতদিনের তিল তিল সঞ্চয়ে নতুনও একটু করেছে। শশাঙ্কের বিস্ময়—অভাবের সংসারে খাওয়া-পরা যেখানে কোনো মতে চলে, সেখানে সঞ্চয় থেকে সোনার গয়না! তরুবালা বলে 'অভাবের সংসারেই তো পরথম্ থিক্যা গয়নার চিন্তা করতে হয়। নইলে বড় লুকের আবার ভাবনা কী?'

সুলোচনা চট্‌পট্ সব কাজ করতে পারে। রান্নার কাজে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তরুবালা বড় একটা পাঠায় না। কিন্তু নিজের সেলাইয়ের কাজ ছাড়াও জল তোলা, ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা, বিছানা তোলা, ঠাকুরের বাসনপত্র মাজা, ফুল তোলা— সবই করে। দোকান-বাজারের কেনাকাটার কাজও তাকে মধ্যে মধ্যে করতে হয়, বিশেষ করে জুড়ানকে যেদিন সকাল সকাল কাজের জন্য বেরোতে হয়। এরই মধ্যে সুলোচনা চটের উপর রঙিন উলের বুননে সুন্দর সুন্দর পূজার্চনার আসন ও ঘরের অন্যান্য সেলাইয়ের কাজও করে। সুলোচনার গায়ের রঙ ফর্সা নয়, ঈষৎ শ্যামবর্ণ বলা চলে। কিন্তু নাক-চোখ-মুখ সর্বোপরি দেহের গড়ন-সৌষ্ঠবে তাকে অবশ্যই সুন্দরী বলতে হবে। পাত্র তাঁর এতদিনে মিলে যাবারও কথা। সম্বন্ধ এসেছেও চারটি। একটি বাদে বাকীগুলি অবশ্য শেষপর্যন্ত পাত্রপক্ষই বাতিল করেছেন। দুটি ক্ষেত্র বাতিল হয়েছে শুধু পাওনা-গণ্ডা নিয়ে। একটি ক্ষেত্রে তরুবালাই বাতিল করেছে। পাত্রপক্ষের দাবী কিছুই ছিল না। কিন্তু ব্যবসায়ী পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী নয় তরুবালা। তেমন শিক্ষিতও নয় সে পরিবার। প্রতিবেশী এক আধজন এরই মধ্যে কথা শুনিয়েছে, 'মাইয়ার বয়স কুড়ি পার হইতে চলল। অত ক্ষুত্‌ক্ষুতানি কিসের? মাইয়াই বা তোমার কয়ডা পাশ। মাত্তর দু'গা পাশ মাইয়ার অত গুমর ভ্যালা না।'

তরুবালা কোনো উত্তর দেয় না। সুলোচনার কানে এসব কথার টুকরো মাঝে-মধ্যে গেলেও ওর মুখে এব্যাপারে মা-বাবার প্রতি এপর্যন্ত কোন অনুযোগ-অভিমানের সুর ফোটেনি। হাসিমুখে সে সর্বক্ষণ সংসারের কাজ আগলে চলেছে। ভাইটিকে ইস্কুলে পাঠানো, পড়া বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও সে পালন করে। আদরের অঞ্জনও দিদির কথা খুব শোনে। মায়ের সময় না থাকলে সুলোচনাই ভাইকে খাইয়ে দেয়। অঞ্জন মায়ের কাছে শোনে পুরানো দিনের রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের

কথা আর দিদির কাছে শোনে আধুনিক গল্প। দুই-ই সে ভালবাসে। দিদির গল্পগুলি বিভিন্ন বছরের ছোটদের পূজাবার্ষিকী থেকে সংগৃহীত। মাঝে মাঝে সে নিজের মতো একটু তৈরী করেও বলে।

সদাপ্রসন্ন তরুবালা জুড়ান দাসের সংসার যেভাবে ধরে রেখেছে তাতে তাকে কিছুই ভাবতে হয় না। বছরের কোন্ সময়ে কোন্ জিনিসটি চাই, তা বুঝে আগে থেকে তার জন্য সেইমত অর্থের সংস্থান করে রাখে তরুবালা।

জুড়ান বুঝতেও পারে না কোথা থেকে টাকা এল, ব্যবস্থা হয়ে গেল সুন্দর। অসুখ-বিসুখে অধীর হলে চলে না। ব্যবস্থা তো সঙ্গে সঙ্গে করতেই হয়। কিন্তু ধৈর্যরক্ষা করা কঠিন। সে ধৈর্যহারা চঞ্চল হলে তরুবালা এগিয়ে এসে তাকে শান্ত করে তার কাজে পাঠিয়ে দিয়ে বলে 'তোমার কিছু ভাবতে হইব না। আমি দেখত্যাছি।'

সত্যিই ভাবতে হয় না বলেই জুড়ানের কোন সমস্যাই নেই। সে সুখেই আছে। কিন্তু তরুবালা দুঃখ-সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়েও জুড়ানের চেয়ে প্রসন্ন। প্রচণ্ড শীতে উপযুক্ত গরম পোশাক, লেপ-তোষকও পর্যাপ্ত নয়—প্রত্যেকের জন্য কাঁথা তৈরী করেছে তরুবালা। তার সঙ্গে আছে দুটি জীর্ণ কম্বল আর একটি লেপ। এতেই সকলে খুশী মনেই শীত কাটায়। বছরের জামা-কাপড় হিসাব করেই সে কেনাকাটা করে। সুলোচনা নিজের জামা নিজেই সেলাই করে নেয়। কখনও বা পরে মায়ের শাড়ী।

তরুবালার প্রতিবেশিনী দু-চারজন আসেন। গল্প করেন, তাদের সংসারের গল্পই বেশী। বেশীরভাগেরই আর্থিক অবস্থা তাব চেয়ে ভাল। তবু সুখে তারা নেই। অশান্তি লেগেই আছে তাদের সংসারে। তরুবালাকে দেখে তাদের একটু হিংসাও হয়।

আর একটু আরাম, আর একটু সুখের স্বপ্ন দেখেছিল জুড়ান। কিন্তু এখন তা আর ভাবে না সে। স্বাচ্ছন্দ্য আর একটু দিয়ে রাধামাধব তার শ্রমলব্ধ কষ্টার্জিত সুখটুকু কেড়ে নেননি।

তাই ভাল আছে, সুখে আছে তরুবালা আর তার সংসার।

সপ্তবিংশতম অধ্যায়

রুদ্রকান্ত-কাণ্ড

রুদ্রকান্তবাবু সহসা রুদ্রমূর্তি হন না। কিন্তু আমার কপাল মন্দ ব'লে সেদিন প্রভাতেই এমন কাণ্ড ঘটে গেল। বাজারের থলি হাতে সবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। রোজই নাকি আমার বাজার আনতে 'আড়াই পহর' হয়, গিন্নির অনুযোগ। তাই ভাবলাম রোদ চড়বার আগেই সেরে আসি বাজারটা। আমাদের গলির তিনটি বাড়ি পেরলেই বাঁদিকে রুদ্রকান্ত দত্ত মশাইয়ের বাড়ি। দীর্ঘদিনের একান্নবর্তী তিন ভাইয়ের সংসারটি দু'বছর হল ভেঙে তিন খণ্ডই হয়েছে। একখণ্ড



বাজার আনতে 'আড়াই প্রহর'।

বিদেশ-বিভুঁই। বাকী দু'খণ্ড খড়দহের শান্তিনগর কলোনীর মূল বাসভবনের একই আয়তনে পাশাপাশিই রয়েছে। চারদিন নৈহাটিতে আত্মীয়-কুটুম্বের খোঁজে কাটিয়ে গত পরশু সন্ধ্যায় ফিরেছি। সামনের রাস্তাতেই নতমুখে পায়চারি করছেন দেখে একটু দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বলি 'কেমন আছেন?'

হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখটা তুলে আমার দিকে একটু কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বললেন, 'এয়ারকী পেয়েছেন? মজা দেখছেন, না?' 'ভাই ছেড়েছে, ছেলে-বৌ বিদেশ পাড়ি দিল। নুটু নিখোঁজ হল।' শেষের কথাগুলো বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদেই ফেললেন।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। নিজেকে অপরাধী মনে হল। পুত্র-পুত্রবধূর বিদেশ যাত্রার খবরটা রাখতে পারি নি। কিন্তু নুটু কে বুঝে উঠতে পারলাম না। কিছুক্ষণ· নতমস্তকে মৌন থেকে মাথা তুলে ওর বাড়িব দ্বার পর্যন্ত এগিযে দিয়ে কবজোড়ে বললাম পরে এসে শুনব সব।

বাজার থেকে ফিরে ন বছরের নাতনির কাছে শুনলাম নুটু হল রুদ্রকান্তের আদরের একটা বেড়াল। তিনদিন হল সে নিখোঁজ। থানা পর্যন্ত যেতে চেয়েছিলেন। সবাই ধরে থামিয়ে বলেছে, বেড়ালের ডাইরী নেওয়া হয না। ছেলে-বৌ-এর বিচ্ছেদ-শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই নুটুর অন্তর্ধানে খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন রুদ্রকান্ত।

কন্যা সুলেখাই রুদ্রবাবুর সংসারটিকে বিশেষভাবে সামঞ্জস্যের যাদুশক্তি নিয়ে আগলে রেখেছিল। অগ্রজা এই ভগ্নীটির সব কথাই ওর দু'টি ভাই মেনে চলত। পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আসাক— সব ব্যাপারেই দিদির কথাই সকলের বেদবাক্য।' মায়ের কাজকে কত সহজে ভারমুক্ত করে তুলেছিল তা এ অঞ্চলের সকলেই দেখত, আর সুলেখার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হত।

কিন্তু তার বিবাহের পর সংসারটি যেন অথৈ জলে পড়ল। তিন মাস ধরে শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে এসে ওকে তা সামলাতে হয়েছে। পড়াশুনায় সকলেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ভাইদের পড়বার খরচ মেটাতে গিয়ে সুলেখা বি. এস্ সি. পড়ার পর আর পড়াশুনা করে উঠতে পারেনি। কিন্তু ওর স্বার্থত্যাগের কথা এ পরিবারের যাদের মনে রাখার কথা, তারা যথাসময়ে যথানিয়মেই বিস্মৃত হয়েছেন।

আমার মুস্কিল হয়েছে, নিকটতম প্রতিবেশীর উন্নতি বা আনন্দজনক ব্যাপারে নিজের আনন্দটা ব্যক্ত করতে যাওয়ার দোষটা কিছুতেই কাটাতে পারি না। এ ব্যাপারে আমাকে বাড়ির সবাই-ই বারবার সতর্ক করেছে। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। এইতো সেদিন রুদ্রকান্তদের উঠানের পাশের লাউগাছটার বাড়-বাড়ন্ত ভালো লাগায়

যেই একটু আলাপ করতে গেছি, আর যায় কোথায়! আমি বলেছিলাম দাদা, লাউগাছটা তো ভালই লতিয়েছে, কি বলেন?' আমার দিকে কট্মট্ করে তাকিয়ে বললেন 'সহ্য হচ্ছে না বুঝি? লতাবার জো আছে চারদিকে শনির দৃষ্টি, শনির দৃষ্টি! অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেও তার ক্রোধের উপশম হল না। অবশেষে সন্ধ্যার আসরে দাবার সঙ্গী পাচ্ছেন না দেখে সুযোগটা কাজে লাগাতেই জল। খুবই হাসি-খুশী। আপ্যায়ন, কুশল-বিনিময় সবই চলল। আমার সংসারের সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন, কোন কোন বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশও করলেন। অবশেষে রাত আটটায় বিদায় নেবার সময় বললেন 'ভাল থাকার শ্রেষ্ঠ উপায় জানেন'?

আমি কী উত্তর দেওয়া যায় ভাবছি। এমন সময় রুদ্রকান্ত নিজেই উত্তর দিলেন, ভুলে থাকা—বুঝলেন, ভুলে থাকাই ভাল থাকা। আর কোন পথ নেই, যতই চেষ্টা করুন না কেন—হাঃ হাঃ।

রুদ্রকান্তের এমন প্রশান্ত মূর্তি দেখব ভাবতে পারিনি! মনে মনে আওড়াতে হল— 'রুদ্র, যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মে পাহি নিত্যম্।'

কিন্তু রুদ্রকান্ত যে শুধু অপরকে পরামর্শ-উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন না, তা দেখে অবাক হলাম। একদিন লক্ষ্য করি সারা বাড়ির ছাদ ঘষছেন, গামছা কাঁধে, পরিধানে লুঙি। আর একদিন দেখি দু ডজন ফুলের টবের জন্য নীচে থেকে মাটি বয়ে আনছেন—সার প্রস্তুত করছেন। এরপর প্রায়ই বিচিত্র ফুলের গাছের পরিচর্যা করতে দেখেছি। যতদিন যায় দেখি ছাদটা ক্রমে চাষের ক্ষেত করে ফেলেছেন। অনেক মাটি ফেলে ছাদেই দিব্যি পালঙ ও অন্যান্য শাক তৈরী করেছেন। লাউ-কুমড়ো গাছ ছেয়ে ফেলেছে গোটা ছাদ। ফল যখন বিশেষ থাকে না ডগা কেটে সব্জীর কাজ চলে।

গোটাপাঁচেক নারকেল গাছে ভালই ফলন। নারকেল কিছু রেখে বাকীটা বিক্রী করে দেন। এবার দেখছি বিক্রী বন্ধ করে নারকেল কেটে শুকিয়ে তেল তৈরী হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক হলাম যেদিন দেখি, নীচের উঠোনটায় বসে দুপুরে নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরীর কাজ চলছে। বলছেন দেখুন, সময় কোন্ দিকে কাটে আপনি টেরও পাবেন না। কাজের জিনিষও হল সেইসঙ্গে।

রুদ্রকান্ত তাই এখনও হেসে বলেন 'মন ফাঁকা রেখেছেন তো মরেছেন। যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে বাসা বাঁধবে। তাই আমার এই কাজের ফর্মূলা, কি কন, ভাল না'?

ঘাড় নেড়ে হেসে সম্মতি জানাই। হাত বাড়িয়ে বলি, দিন আপনার ছোঁওয়া একটু।

অষ্টবিংশতম অধ্যায়

অমরদার কথা

'অমরদা'কে অবন্তীপুরের সবাই চেনে। তাঁর উপস্থিতি কণ্ঠস্বরে পূর্বেই ঘোষিত হয়। মোটা গলায় হাঁক পেড়ে গৃহে প্রবেশ করেন। তার জন্য সবারই অবারিত দ্বার। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হলেও ষাট-সত্তর সকল বয়সের মানুষের কাছেই তিনি অমরদা। গায়ের রঙ একটু কালো, মুখখানি খুশীতে আলোকিত। সাদা পায়জামার সঙ্গে হাফসার্ট পরা অমরদা এককাপ চা অথবা একটা পান পেলেই খুশীতে ডগমগ। উদাত্ত কণ্ঠে শ্যামাসংগীত বা ভক্তিমূলক কোন গান ধরে বসবেন। মুহূর্তেই যে যেখানেই থাকুক কাজ ফেলে এসে অমরদার গান শুনতে বসে। দু'টি কি তিনটি গান গেয়ে দু'চারটি কথা বলে উঠে পড়বেন তিনি।

বাঁধা রুটিনে চলেন। স্নান-পূজাদি, মায়ের সেবা আছে। আবার গুটিকয়েক ছেলে জুটিয়েছেন—তাদের নিয়ে দুপুরে বসেন লেখাপড়া শেখাতে। লেখাপড়াই বা শুধু বলি কেন, একটু গানও শেখান সেই সঙ্গে। ওরা সন্ধ্যাবেলায় অমর-কুটীরে এসে নামগান করে—শ্রীরামকৃষ্ণের স্তব-প্রার্থনাতেও যোগ দেন। একটু বাতাসা কলা যা হোক কিছু প্রসাদ পেয়ে খুব খুশী হয়ে বাড়ি ফেরে। ছেলেগুলির বাড়িতে পড়াবার সামর্থ্য নেই—সবদিন খাওয়া জোটে কিনা সন্দেহ। অমরদা তার সামান্য আয় থেকেই ওদের বইখাতা কিনে দিয়ে থাকেন। জন তিনেক তো ছ'মাসেই নিজের নাম লিখতে শিখে ফেলেছে। ঠাকুরের গল্প ওরা বলতে পারে দু'চারটে। অমরদা বিশেষ বিশেষ ছুটির দিনে ওদের গল্প শোনান। সংসারে রয়েছেন তাঁর বিধবা মা ও এক ভাই। অপর ভাইয়ের সংসার অন্যত্র। একমাত্র বোনের শ্বশুরবাড়ি



বর্ধমানে। বেশী রোজগারের ভাইটি যথানিয়মে বিবাহের দু'বছর বাদে অবন্তীপুরের এবাড়ি ছেড়ে বিশ মাইল দূরে নিশ্চিন্তপুরে ফ্লাট কিনে বসবাস করছেন। মাসে মাসে টাকা দিতে না পারলেও বছরে অন্ততঃ দুবার এসে মায়ের খোঁজ-খবর করেন। কিছু হাত খরচও ঐ সময় তাঁর হাতে দিয়ে যান।

অবন্তীপুর কলকাতা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে। বর্ষা-বসন্ত-শরৎ প্রকৃতি এখানে হৃদয়ে সাড়া জাগায়। মনকে উদাস করে। সেদিন অমরদা একরাশ পলাশফুল এনে হাজির করেছেন—বলছেন, কিছুই তো দিতে পারি না আপনাকে—নিন সামান্য অঞ্জলি। খুশী হয়ে তার হাত থেকে রাঙা পলাশগুলি নিয়ে সাজিয়ে রাখি টেবিলে, আর দু'টি ছবির নীচে।

শুনেছি কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে কোনও এক যন্ত্রপাতির দোকানে দেখাশোনার জন্য বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অমরদাকে কাজ করতে হয়। রবিবার ছুটি থাকে। কখনও কখনও বৃহস্পতিবারও ছুটি পেয়ে যান। মালিক মাড়োয়াড়ী খুবই ভক্তিপরায়ণ। গণেশ, লক্ষ্মী ও জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা খুবই সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অমরদা বলেন, 'উপবাসী থেকে শুদ্ধাচারে পুরোহিতের পাশাপাশি নিজে মন্ত্রোচ্চারণে পূজায় অংশ নিয়ে থাকেন তিনি। এসব পূজায় অনেকবারই অমরদা গিয়ে অংশ নিয়েছেন—ভজন গান গেয়ে ওদের আনন্দ দিয়েছেন, ওঁদের আত্মীয়-স্বজাতি ভাইয়েরা বিস্মিত, অভিভূত হয়ে কিছু উপহার দিতে গেলে তা সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সেদিন বসন্তের সকালে সাড়ে দশটা থেকে বৈঠক চলছে। এগারোটা পনেরোয় অমরদা এলেন আনন্দনিকেতন ভবনে। কিছুক্ষণ শুনলেন আলোচনা। আর্যসভ্যতার আদি উৎস সম্পর্কে বারোটা পর্যন্ত শুনে বেরিয়ে পড়লেন একা। সবার জন্য আয়োজিত সামান্য একটু মিষ্টি এগিয়ে দিতে গেলাম। নিলেন না। ঘরে তৈরী কুলের আচারটুকুতেই তৃপ্ত।

বি.টি. রোডের ধারে আদিনাথ বাড়ুজ্জের বাড়িতে উচ্চকণ্ঠে শ্যামাসংগীত গাইতে গাইতে প্রবেশ করলেন। আদিনাথ ব্যস্ত হয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সাদরে এনে বসাতেই বলছেন একটা টাকা দিন তো, নস্যি ফুরিয়েছে। আদিনাথ পাঁচ টাকার একটা মুদ্রা আনলে নিলেন না। বললেন, একটাকা চাই। থাকলে দিন, নইলে থাক।' শেষ পর্যন্ত আদিনাথকে একটি টাকাই এনে দিতে হল।

মনে পড়ছে এবছর পূজার ক' দিন আগে এসে সঙ্কোচের সঙ্গে বলছেন, একটা উপকার করতে হবে, ত্রিশটি টাকা চাই, হবে?' ব্যস্ত হয়ে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট এনে হাতে দিলাম। হেসে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন। আদিনাথ মনে মনে

ভাবলেন, এই মানুষটিকে অনেক দিনই কিছু দেবার চেষ্টা করেও দেওয়া যায়নি। যাক, আজ তবু একটু সুযোগ পাওয়া গেল। একটু আনন্দ অনুভব করি। এরই মধ্যে দেখি অমরদা ফিরে এসে ডাকছেন। বললাম, কী ব্যাপার? কিছু ফেলে গেছেন বুঝি?

হেসে দু'টি দশ টাকার নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'খুব উপকার হল দাদা, আজ আসি তবে।' পূজার কদিন ব্যস্ত সবাই। একটি বাড়ির পূজায় আমাকেও প্রতিবারের মতো যোগ দিতে হয়েছে। দশমীর পরে বাড়ি ফিরে শুনেছি একদিন অমরদা নাকি একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

লক্ষ্মীপূজার দু'দিন পর অমরদা আবার এলেন বেলা সাড়ে দশটায়। বললাম, 'আসুন ভিতরে। বসুন এসে।' ভিতরে এলেন না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই বললেন, 'আজ আর বসব না। এই ছেলেটির জন্যই আপনাদের তিনজনের কাছে গিয়েছিলাম। জামা আর হাফ প্যান্ট পরা ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখি। হাসি মুখে এসে প্রণাম করছে। দুটি বিস্কুট ওর হাতে দিলাম। কিছুতেই অমরদাকে আর বসানো গেল না। ওই এক বিচিত্র স্বভাব। একবার যদি 'না' বলেছেন, কোনও ব্যাপারে তাঁকে 'হ্যাঁ' করে, কার সাধ্যি!

তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম। নিজেকে খুব ছোট মনে হল। মনে ভেবেছিলাম 'যাক, বহুদিন পর অমরদার কাজে একটু সাহায্য করা গেল। কিন্তু আত্মপ্রসাদ কোথায় মিলিয়ে গেল! আমার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। এত অহঙ্কার আমার! যাঁর অকৃপণ মহৎ দানে নিত্যদিনের ভাণ্ডার উঠছে ভ'রে—তাঁরই আলোয় নয়ন মেলে তাঁর দানকে দেখলাম এত ছোট করে?

মাঝে-মধ্যে দু'একবার অমরদার বাড়ি গেছি। তাঁর জীর্ণ কুটীরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যপূজায় গানে সকাল-সন্ধ্যা মেতে আছেন। ছেলেগুলি সন্ধ্যায় যোগ দেয় প্রার্থনায়। অভাবকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে সদা হাস্যময় অমরদার জীবন কাটছে। কোন অনুযোগ নেই ভাইয়ের প্রতি। মাকে যথাসাধ্য ভরণপোষণ আর সেবাকে কত সহজে গ্রহণ করেছেন।

কেমন আছেন অরমদা? এরপর আর প্রশ্ন নিরর্থক। তাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠের গান আর প্রসন্ন মুখই জানিয়ে দেয় তিনি কেমন আছেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়

উদাসী হাওয়ার পথে

বেলা সওয়া দশটা। মধ্যমগ্রাম স্টেশনের পশ্চিমপারে একটু হেঁটে এসেই পাওয়া গেল সাহেব-বাগানের ভ্যান-রিক্সা। হরিসভা যাবে কিনা প্রশ্ন করতেই হেসে বসতে বলল। ওদিকে রিক্সা চলে না। সঙ্গে বিশ্বনাথদা। ঘোরাফেরা যখন-তখন চলতে পারে। লেখক সুরসিক নরেশবাবুও দু'বছর হল শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন। গানের শিক্ষক রূপে ঐ অঞ্চল এবং বাইরেও তাঁর প্রসিদ্ধি হৃদয়পুর অঞ্চলের সর্বজনবিদিত। তাঁর লেখা শুনব ঘণ্টাদুয়েক ভেবে চলেছি।

চালক প্রসন্ন খুশী মনে অনেক কথাই বলে চলেছে—'নরেশ মাস্টারমশায় ইদিক্‌কার সকল ঘরের ছেলেমেয়েদের মানুষ কর্‌য়েছে। আজ অনেকজনাই চাকরী-বাকরী, নানা কাজ-কাম্ কর্‌য়ে খাচ্ছে। লেখাপড়া জানলিই হল্য না বাবু, স্বভাবডা গড়ন চাই'— হরিসভাতে নেমে পাঁচ টাকা দুজনের ভাড়া হলেও আমাদের দুজনকেই শুধু নিয়ে এসেছে দেখে দু'টাকা বেশী দিতে গেলাম। কিছুতেই সে নিল না। বলল, 'ভাড়া বেশী নেওয়া অধম্ম বাবু। আপনাগো আশীব্বাদে যা পাই তাতি তো সংসারডা ভালই চলি যাচ্ছে।'

এক ছেলে এক মেয়ে বৃদ্ধা মা আর স্ত্রীকে নিয়েই প্রসন্নর সংসার। খুলনার এক গ্রাম থেকে দেশভাগের দু'বছর বাদে ওর বাবা মা দু'বছর বয়সের প্রসন্নকে নিয়ে এখানে আসে সর্বস্ব হারিয়ে।

সাতের দশকের প্রথম দশ বছর কেটেছে ঘরামির কাজ করে। বেশীর ভাগ বাড়ির টালি, টিন অথবা খড়ের ছাউনির কাজ। ক্রমে এসব অঞ্চলের লোকের পয়সা হল—বড় বড় কংক্রিটের বাড়ি উঠল। কাজ পাওয়া হল কঠিন।

অনেক কষ্টে প্রসন্ন কিছু টাকা দিয়েছিল। এক সহৃদয় ব্যক্তিও দিলেন বাকী টাকা। ও একটা ভ্যানরিক্সা কিনল। প্রতিমাসে কিছু করে টাকা দিয়ে চার বছরে ও সে টাকা শোধ করেছে। এখন মাসে গড়ে ওর আয় তিন হাজার টাকা। কোন কোন মাসে কিছু বেশী আয় যেমন হয়, তেমনি বর্ষার দিনে মধ্যে মধ্যে একেবারেই যাত্রী পায় না। প্রথম কয়েক বছর প্রসন্ন মালপত্র বহন করত। পরে সাহেব-বাগান, দেশবন্ধুনগর, অরবিন্দ পল্লীর দূরের পথগুলিতে রিক্সার পরিবর্তে লোকে ভ্যান-

রিক্সাতেই বেশী চড়তে লাগল। তাই বিগত পঁচিশ বছর ধ'রে ও যাত্রীই বহন করছে।

কবিগানের একটি দলে কিছুকাল গান গেয়েছে প্রসন্ন। অনেক দূরে দূরে দলের সঙ্গে পাড়ি দিতে হয়— সংসার দেখাশুনা হয় না দেখে সে দল ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে ও এক কীর্তনের দলে দোহার হিসাবে গান গায়। বিশ-পঁচিশ টাকার বেশী পায় না, তবু 'ভাল লাগে—একটু গানেরও চর্চা হয়' বলে যায়। গলায় তুলসীর কণ্ঠীমালা দেখে কৌতূহলী হয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলে সব বলল। বলেছিলাম 'কীর্তন আমারও ভাল লাগে। একদিন তোমাদের গানের আসরে যাব, খবর দিও।'

প্রসন্ন একটু লজ্জিত ও বিস্মিত হয়ে প্রথমটা ইতস্তত করেছিল। পরে কথা দিল 'আচ্ছা, সে একদিন শোনান যাবে আপনারে।' প্রসন্নর বিবাগী মন সংসার ছেড়ে অন্তরে-বাইরে বৈরাগী হতে চেয়েছিল, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। ওকে শেষ পর্যন্ত সংসারীই হতে হল। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে ওর বিবাহ। স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, নিয়ে চলছে সংসার। পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে আসার অল্পকালের মধ্যেই ওর মাতৃবিয়োগে সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়ল। প্রসন্ন নিজেই রান্নাবান্না সাবান-সোডা কাচাকুচি সবই চালিয়েছিল সাত-আট বছর। তারপর মধ্যে মধ্যে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। ফিরে আসত নিজেই। আবার উধাও হ'ত। কখনও সাতদিন, কখনও তিন সপ্তাহ কাটিয়ে ফিরে আসত। বাপ জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলত গানের দলে গান গাইতাম—ওরা আমায় ছাড়তে চায় না। তাই আসতে দেরী হল। রান্নাবান্না ও ঘরের অন্যান্য কাজের জন্য এক মহিলাকে ঠিক করেছিল আশি টাকা মাস-মাহিনায়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তার অনুপস্থিতিই সব গড়বড় করে দিল। বাপের কথা আমল দেয় না দেখে প্রতিবেশী ও আত্মীয় দু'চারজন এক মেয়ে দেখে প্রসন্নর বিয়ে দিল। দু'পাঁচ বছর ঘরে মন দেখে সবাই ভাবল তারা জয়ী হয়েছে—ঘর ছেড়ে প্রসন্ন আর বাইরে যায় না। কিন্তু ছেলেমেয়ে একটু বড় হতেই মধ্যে মধ্যে ও আবার বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে কখনও তিন দিন, কখনও বা সাতদিন বাদে। স্ত্রী অমলার প্রথমটা খুবই দুশ্চিন্তা হয়েছিল। প্রসন্নর বাপ তাকে বুঝিয়েছে—ওর একটু গানের নেশা আছে। ভয় নেই, দু-চার দিন বাদেই ফিরবে।

সত্যিই তাই। সেই থেকে অমলা ওকে নিজেই বলে, 'গানে যাবে কবে? এমাসে গেলে না তো?' দু'একবার অমলাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে শান্তিপুর, নবদ্বীপে ওদের গানের দলের সঙ্গে। ভাল লেগেছে তার। প্রসন্ন চেয়েছিল অমলাকে গান শিখিয়ে দলে নিতে। কিছুদিন গান শিখেছিল। গলাটা মন্দ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমলা সংসার ফেলে যেতে পারেনি। একদিকে বৃদ্ধ শ্বশুর, অপরদিকে ছোট ছেলেমেয়ে। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। শ্বশুরের দেহাবসান হয়েছে বিশ

বছর হল। ছেলেটি বড় ইস্কুলে পড়ে। পড়াশুনায় বেশ মাথা আছে। মেয়েটি একটা পাশ দিয়েছে। পড়ছে এখনও। অমলা এরই মধ্যে ওর জন্য বর খুঁজতে শুরু করেছে। প্রসন্ন বলে, 'লক্ষ্মী যখন পড়তি চায়, তোমরা তারে কেন তাড়া লাগাও? ও পড়ুক না, আমি যেভাবে পারি ওর খরচ যোগাব।' প্রসন্নর এসব কথায় অমলা উত্তর না দিলেও ওর হাবভাবই জানিয়ে দেয় এতে ওর সমর্থন নেই।

দেশবন্ধুনগর, অরবিন্দরোড ছাড়িয়ে, হৃদয়পুরের পথে মধ্যে মধ্যে প্রসন্ন তার ভ্যানরিক্সায় পথ চলে। গ্রীষ্মের ঝোড়ো হাওয়ার পর বাতি-নেভা পথে, কালিমাখা মেঘে-আকাশ ছাওয়া পথে, মাথার উপর শরতের শান্ত নীল আকাশকে রেখে, মুকুলের সৌরভমাখা বসন্তের ঝরা পাতার হাতছানিতে ওকে পথ চলতে হয়। একটু নির্জন পথে স্বল্প যাত্রী নিয়ে বা একা ওর কণ্ঠে কৃষ্ণের মোহন বাঁশির সুর ওঠে। দূর থেকে অনেকেই সে-সুর চিনেছে। প্রসন্নকে তাই মধ্যে মধ্যে রিক্সাস্ট্যান্ডে



পাওয়া যায় না। ওর সঙ্গীচালকেরা বলে 'গানে গেছে, কবে আসবে, কেউ জানে না।' বাড়ির সকলেও জানে তিনদিনে যেমন ফিরতে পারে, পাঁচ-সাত দিনও হয়ে যেতে পারে তার ফিরতে। ঘরে চাল-ডাল-তেলের ব্যবস্থা সে করে রাখে। কখনও বা যাবার আগে কিছু টাকা দিয়ে যায় অমলার হাতে।

গানের দলের রাখাল, গোপাল, নীতু, রাজু, সুধীর—সবাই টাকার হিসাব করে তিন/চার/পাঁচ আসরে কত টাকা মিলেছে—চিন্তা করে বাড়ির জন্য সুবিধেতে কোথা থেকে কি কেনাকাটা করা যায়। প্রসন্নর এসব ভাবার সময় কোথায়? উদাস-করা সুদূরের বন-প্রান্তর-আকাশ কত খুশীর কথা বলে। কেবলি চেয়ে থাকে। সুর শোনে। সে বাঁশির সুর শোনে। মাঝে মাঝে ওকে খুঁজে আনতে হয়। কিন্তু বাঁশির সে মধুর সুর মধ্যে মধ্যে হারিয়ে যায় সংসারের উথাল-পাথাল-করা ঢেউয়ে। কান পাতলে শুধু সাগরের ভয়-জাগানো জলের শাসানি। ঘর আগলাতে হয়, ঘরের মানুষগুলিকে সামলে নিতে হয়।

আবার পথ চলে। ওর ভ্যানরিক্সা চলে। আবার গান ওঠে প্রসন্নর কণ্ঠে।

কর্মব্যপদেশে বাইরে থাকতে হয়েছে সাত বছর। অনেকদিন দেখা হয়নি প্রসন্নর সঙ্গে। এবার খোঁজ নিতে গিয়েই দেখা হয়ে গেল। আগের মতই হেসে জানাল, 'গোবিন্দের ইচ্ছায় ভালই চলছে।' দিনপাঁচেক বাদে ভ্যানরিক্সা স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে আসছি। ওকে দেখা গেল না। ওর সঙ্গীচালকরা বলল, 'বিকালে সবদিন আসতি পারে না। নাতিরে দেখ্‌তি হয়। জামাইডা মর্যো গিয়েই ত হইছে যত জ্বালা! তানালি তো বাবু, বেশ চলতিছিল।'

আমি স্তম্ভিত হই। একটু নিজেকে সামলে বলি, 'সে কি! সেদিন তো এসব কিছু বলল না!'

ঘরে ফিরতে ফিরতে সমস্ত পথ ভাবি 'না, না, প্রসন্ন তো ভুল কিছু বলেনি! ও তো ভালই আছে। গোবিন্দ তো ওকে ভালই রেখেছেন!'

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

সুজনের স্বপ্ন

মসলন্দপুরেব এক গণ্ডগ্রাম। পরেশবাবুর বাড়িতে ছিল স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্য-শিষ্যাদের এক সম্মিলন। শ্রাবণের মাঝামাঝি। বিকেল থেকেই মেঘ করে দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পূর্বেই বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। এখন সন্ধ্যা সাতটা। একটু আগেই গান আরম্ভ হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশজন মত উপস্থিত হয়েছেন। এখনও কিছু ভক্ত আসছেন। প্রশস্ত একটি কক্ষ। পাশে বেশ কয়েকটা আম, নারকেল-সুপারির গাছ। মাইকের সঙ্গে দুটি বৈদ্যুতিক পাখাও এনেছেন দেখছি। দুটি জানলা দিয়ে পূবের ঠাণ্ডা হাওয়াও একটু আসছে। তিনটি ঘর, সংলগ্ন বারান্দা। দক্ষিণের প্রবেশ পথের সামনে কিছু ফুলের গাছ! বিশ বছর আগে এ গ্রামে পরেশবাবুর বাড়িটি ছাড়া আব মাত্র দুটিই পাকা বাড়ি ছিল। এখন প্রায় ত্রিশটি পাকা বাড়ি দেখা যাবে। কৃষিজমি বেশ কিছু বিক্রী হয়ে বাড়ি হয়েছে। এখনও চাষের বেশ কিছু জমি এখানে রয়েছে। বলা শক্ত কতদিন তা রক্ষা করা যাবে।

কয়েকটি কণ্ঠের গান সকলকে মুগ্ধ করেছে। বারো বছরের একটি বালিকার গান শুনে তো কেউই আর তাকে ছাড়তে চায় না। এখন চলছে কীর্তন। সুর-তাল-ছন্দ আর ভাবে এক পৃথক জগৎ রচিত হয়েছে। কীর্তন থামতেই দাঁড়িয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে একজন শোনালেন বাউল গান, সঙ্গে দোতারা ও শ্রীখোল—

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনিঋষি চারযুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।।
জলে যেন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাত কে কাঁপায়,
তেমনি সে থাকে সদাই—আলোকে ব'সে।।

সদা-আলোকে বসা প্রাণের মানুষটাকেই খুঁজে বেড়াই মনের ভ্রমে কত জঞ্জালে! পাওয়া হয় না। লুকিয়েছে সে হৃদয়পুরে। বাউল গাইছেন—'আমার হল কি ভ্রান্তি মন/আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন।'

পরিচয় হল সুজন নন্দীর সঙ্গে। দোতারা বাদক। গানও একটু জানেন। গলায় তুলসী কাঠের মালা। পুরো বৈষ্ণব না হলেও আধা বৈষ্ণব উনি। গান থামলে কিছু

কথা হল। একটু দূরে অপর এক গ্রামে বাড়ি। একদিন তার গান-বাজনা শুনতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই তিনি বলে বসলেন, 'সকাল করিয়া আসেন যেন। গরীবের কুটীরে দুইটি ডাইল ভাত সেবা গ্রহণ করতে হইব, কইলাম।' সানন্দে নন্দী মশাইয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

আশ্বিনের প্রথমভাগে সকাল সাতটায় রওনা হয়ে সুজন গায়েনের বাড়ি পৌঁছতে বেলা দশটা পার হয়ে গেল। স্টেশন থেকে যাত্রীবাহী ভ্যানে আসতে হল। রাস্তার অবস্থা ভাল নয়, তাই প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ সুখকর হয়নি। মন অবশ্য ভরে গেছে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের সবুজ ক্ষেত দেখে।

পরিচ্ছন্ন ঝক্‌মকে আঙিনা। দূর থেকেই গান শুনতে পেলাম—'আর না পাঠাব গিরি, প্রাণের উমা হরের ঘরে।' আগমনী গান এমন পরিবেশে কতদিন শুনিনি। প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পথের কষ্ট আর রইল না। ঘরে খবর পৌঁছে যেতেই গান বন্ধ হল। সুজন ভাই অপর এক সঙ্গীকে নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়েই আনন্দে উচ্ছল হয়ে হাসিমুখে নত হয়ে 'জয়গুরু' সম্ভাষণে আলিঙ্গন করে ঘরের দাওয়ায় আসতেই একটি ছেলে ছোট জলের বালতি ও গামছা রাখল আমার পায়ের কাছে। পা ধুয়ে আসতেই সুজন ব্যস্ত হয়ে বসবার আসন পেতে করজোড়ে হাসিমুখে বলে, 'বহেন কত্তা। একটু জিরাইয়া লন। পথে বড় কষ্ট পাইছেন।' একটি ছোট মেয়ে পাখা এনে বাতাস করতে আরম্ভ করে। আমি হাত থেকে পাখাটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলি 'কষ্ট তেমন কিছু নয়, গ্রামে-গঞ্জে এমন অনেক দেখেছি। পথের দুধারের শস্যক্ষেত মন কেড়ে নিয়েছে। সব ক্লান্তি ওতেই দূর হয়েছে।'

মনের কথা কইবার আগে আঁখি ঝইর‍্যা যায়/মন তোর আপন বলতে কে আছে/ও মন গুরু ভজরে/মন যা কর ত্বরায় কর/খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখী/আমায় ডুবাইলি রে—একের পর এক গান চলল। মধ্যে আমার জন্য কাঁসার থালা ভর্তি মুড়ি-নারকেলকোরা, চিনি এল। তার উপর শোয়ানো দুটি কলা। সঙ্গে একবাটি দুধ। অনেক অনুরোধ করেও কোনো ফল হল না। অর্ধেকটা কমাতে বলেছি। কেউ এল না কমাতে। উত্তর মিলল, বেশী কোথায়? থালার একপাশ থেকে খানিকটা খাবার চেষ্টা করলাম। একজন দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললেন, 'ওইভাবে না।' বলেই থালার মুড়ি ঢেলে দিলেন দুধের বাটিতে।

দ্বিপ্রহরের আহার হল সুক্তো, মুগডাল, তরকারী, চাটনি আর দই-মিষ্টি দিয়ে। একজন সমানে পাখার বাতাস করে গেলেন নিষেধ না শুনে। খুবই অস্বস্তিকর—মেনে নিতে হল এসব। বিঘেখানেক জমি। বেশ কয়েকটা ফলের গাছ। ঘরের সামনের উঠান নিয়মিত ঝাঁট ও গোবর দিয়ে লেপা হয়— দেখে বুঝলাম। দুপুরে বিশ্রামের ব্যবস্থা হল ছোট ঘরটিতে, যেখানে গান হয়েছে। অনেক কথা হল।

অধিকাংশই সাধন রাজ্যের গল্প একের পর এক। পারিবারিক আত্মকথন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দেখে দু-একটি প্রশ্ন কবলাম। উত্তর মিলল—আছিল সবই কত্তা, ধান-পান-জমি-জমা। সবই ফেইল্যা বরিশালেব এক গাঁ থিইক্যা চইল্যা আইলাম। দ্যাশের চাষের জমি বিক্রীর সামাইন্য টাকা দিয়া মসলন্দপুরে এক বিঘা জমি পাইলাম। জমির ধান বিক্রী করিয়া এই বসত জমি আর কুইড়্যাখান বাঁধছি। বাপরে বাঁচাইতে পারি নাই। মায়েরে আনতে পারছি। ভাই দুইডাও আস্ছে। চাইর্ বচ্ছরের কইন্যা আর দুই বচ্ছরের কোলের ছেইল্যা লইয়া আসছি এহানে কত্তা।

—ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা কিছুটা করাতে পেরেছেন তো?

—হ্যাঁ কত্তা, আপনাগো আশীব্বাদে পড়াশুনায় ভাল দেইখ্যাই পারছি পড়াইতে। মাস্টার দিবার পয়সা আমার নাই। অরা নিজেরাই পড়তে আছিল ভালই। মাধ্যমিকে স্টার পাইল। ইস্কুলের হেড মাস্টারমশয় পড়ানের বেবস্তা করল। পাশ



করল। যাদবপুরে চান্স্‌ও পাইল। কিন্তুক্ কপালে নাই সুখ। কলেজ থিইক্যা ফিরবার সময়... কান্নায় ভেঙে পড়েন সুজন। ভাই জীবন বললেন বাস দুর্ঘটনায় দুদিন পরে মারা যায়।

পুত্র স্বপনকে ঘিরে সুজনের স্বপ্ন ছিল। পাকা ঘর হবে, মন্দির করবে রাধামাধবের। প্রতি বছর উৎসব হবে। অন্নপ্রসাদ পাবে সবাই—ভাল কীর্তনদল আসবে। আনন্দ ও শান্তি পাবে সকলে।

বিকেলে সুজন দোতারা বাজিয়ে শোনালেন অনেকক্ষণ। হঠাৎ নিজেই তাঁর বাজনার সঙ্গে গান ধরলেন 'মন তোর আপন বলতে কে আছে/কার কাঁদায় কাঁদো মিছে।।/থাক সে ভবের ভাই-বেরাদার/প্রাণসখী সে নয় আপনার/পরের মায়ায় মজিয়ে এবার/প্রাপ্তধন হারাও পাছে।।' গান থামে। চোখের জল মুছে সুজন বলেন, 'দয়াল আমায় পথ দেখাইছেন, আর ভয় নাই। বাপ-মায়ে সাধ কইর‍্যা সুজন নাম রাখছেন। সুজন হইতে পারলাম কই। আমি মন্দমতি, চরণধূলি দ্যান যেন সুজন হইতে পারি, কত্তা। মাথা নীচু করে পায়ের কাছে। আবার কান্না! পিঠে হাত রাখি। স্ত্রীও অদূরে মুখ আড়াল করে চোখের জল মোছেন।

পরে অনেকের মুখেই শুনেছি—সুজনের সুখ্যাতি অনেক। পাড়াপ্রতিবেশীর দুঃখদুর্দশায় ও পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সাধ্যমত সাহায্য করে নিজে অনাহারে থেকেও। গানের দলের সঙ্গে বাজাতে গাইতে ওকে প্রায়ই গোটা রাজ্যে ঘুরতে হয়। বাড়ি সব সময় আসতে পারে না। মেয়েটির জন্য সে আর বেশী চিন্তা করতে পারে না। গান শিখছে গৌরী। বেশ মিষ্টি গলা। বারো তেরো বছর বয়স। এরই মধ্যে বাবার সঙ্গে বসে মধ্যে মধ্যে গান করে। সময় পেলেই ঠাকুরঘরে সবকিছু সাজানো-গোছানো তার নিত্য কর্ম। সুজন খুশীতে বলে 'যুগল সেবার কাজে ওর যেমন মন, তাতে আর ভাবনা নাই, কত্তা। সব সমর্পণ হইলে আর ভয় কি! হাসিতে উচ্ছল হয়ে আবার গান ধরে সে— যে আমারে পাঠাল এই ভব-নগরে।/মনের আঁধার-হরা চাঁদ/সেই সে দয়াল চাঁদ/আর কত দিনে দেখব তারে।।

এরপর অনেকদিন সুজনের খবব রাখতে পারিনি। হঠাৎ জয়দেবের মেলায় সেবার দেখা হয়ে গেল। একগাল হেসে নত হয়ে বলে 'জয় নিতাই'। কুশল জিজ্ঞাসা করতেই জানায় সুখের সন্ধান মিলেছে কত্তা। সামনের রাসপূর্ণিমায় আসেন যেন। রাধামাধবের ইচ্ছায় একটু মন্দির হয়েছে। মন্দিরে নিত্য সেবা চলে। আপনাগো পদধূলি পড়ুক একটু।' সানন্দে সম্মতি জানিয়ে ভাবি—ভাল আছে সুজন। সুজনদেরই তো ভাল থাকার কথা!

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

ফুলমালা

বিনয়রঞ্জন বসাক সেদিন একটু বিস্মিত হলেন। শয্যা ছেড়ে উঠেছেন ভোর পাঁচটায়। বাড়ির সামনের রাস্তায় খানিকটা পায়চারির পর যথারীতি গানের রেওয়াজে বসেছেন। ভৈঁরোর আলাপ বেশ খানিকটা এগোতেই দূর থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এল—মালা নেবেন, মালা—ভালো মালা চাই— নেবেন মা-লা-আ...। মুদারা পঞ্চম থেকে তারা সপ্তকের কোমল রেখাব ছুঁয়ে কোমল গান্ধারে একটানা এমন দাঁড়িয়ে থাকা কণ্ঠস্বর কোথা থেকে আসছে? উঠে পড়লেন গান ছেড়ে। এর আগে দু'দিন শুনেছেন ঐ কণ্ঠস্বর কিন্তু তখন সুযোগ হয়নি দেখবার। তাই আজ আর এ সুযোগ হারাতে চান না। প্রয়োজন না থাকলেও কিনলেন দ'টি মালা। পাশের গলির মুখে আর এক বধূ ফুলের ছোট বস্তা মাথায় দাঁড়িয়ে। সুমনা বলল, আমার ঠাকুরঝি। দত্তপুকুরের এক গ্রাম থেকে নববারাকপুরে আসে সপ্তাহে ছয়দিন। একদিন করে ওরা বাড়ির কাজের জন্য নিজেরাই ছুটি করে নিয়েছে। প্রৌঢ় বিনয়রঞ্জন দু'একটির বেশী প্রশ্ন সেদিন করতে পারেন নি। মালা দুটি হাতে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ রইলেন দাঁড়িয়ে। সেই সুর আশ্চর্য এক ছন্দে রূপায়িত হয়ে দূরে মিলিয়ে যায়।

দু'সপ্তাহ বাদে আবার কিনলেন দুটি মালা। আরো কিছু কথা হল। সুমনা জানায় শ্বশুর-শাশুড়ির বয়স হয়েছে— কাজ করার ক্ষমতা তেমন নেই। তবু তাঁরা মালা গাঁথার কাজে সাহায্য করেন। সুমনার এক ছেলে, এক মেয়ে—ইস্কুলে যায়। ছেলে গতবার হাই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে— ভাল মাস্টারমশায়ের কাছে একবছর এজন্য ওকে পড়াতে বারো শ টাকা লেগেছে। মেয়েটির নাম মালা। প্রাইমারী ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু পড়াশুনা হচ্ছে না। ওর ইচ্ছা সামনের বছর থেকে প্রাইভেট ইস্কুলে পড়াবে। সমীরের একটু জমি আছে। তাতে সব্জীর চাষ হয়। কিছু ধানও হয়। নিজেই সব্জী নিয়ে কলকাতায় পাইকারী বিক্রী করে। স্বামীর আয়ে সংসার চলে যায়। কিন্তু পড়াবার খরচ, অসুখ-বিসুখে ডাক্তারের খরচ, সখের কিছু জিনিস কেনাকাটা হয়ে ওঠে না বলেই পাশের বাড়ির ঠাকুরঝিকে নিয়ে ও ছ'মাস হল এই ফুলের ব্যবসায়ে নেমেছে। একশ মালা বিক্রী করে ওদের প্রত্যেক দিনের লভ্যাংশ কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা।

বসন্তের আর এক সকাল। বিনয়রঞ্জনের বাহার-এর আলাপের অংশ প্রায়

শেষ। পাশের আম গাছের কোকিলটির ডাকে সাড়া দিয়ে চলেছে সমানে দূরের একটি কোকিল। দোয়েল-পাপিয়ারাও সুরের জাল বুনে চলেছে। কিন্তু না, শেষ আর করা হল না গান। সুমনার সেই কণ্ঠ ভেসে আসে—মালা নেবে মালা, ভালো মা-লা-আ...। আরো মধুর লাগছে ওর গলা। যাবে নাকি আর একবার ওর কাছে? কিনবে আজ একটি মালা? না, আজ তো মালার প্রয়োজন তেমন নেই। একবার জিজ্ঞাসা করবে নাকি, সুমনা গান জানে কি না? নাঃ, সেটা ঠিক হবে না।

দোতলার ঘর থেকে নেমে এসে নীচের বারান্দায় দাঁড়ায়। সুমনা বিনয়রঞ্জনকে দেখতে পেয়ে বলে, 'মালা নেবে মেসো? তুমি বুঝি গান কর? গান শেখাও? জান, আমার গান শেখার বড় শখ ছিল। বাপের বাড়িতে একটুখানি শিখছিলাম। বিয়ার পর আর হৈল না।' হাত বাড়িয়ে আজ একটি মালা নিলাম। আশ্চর্য লাগল—আমার মনের প্রশ্নের জবাব আপনিই মিলে গেল। অন্তর্যামীকে অন্তরে প্রণাম জানিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলি 'তোমার ইচ্ছা যদি থাকে দেখবে তা একদিন ঠিকই পূর্ণ হয়েছে।' সুমনা চলে যায়। বাতাসে ওর কণ্ঠ ভাসে।

প্রায় দু'মাস হল সুমনার গলা আর শুনি না। ওর ঠাকুরঝির কণ্ঠের সেই পরিচিত আহ্বান—মালা নেবে মালা, ভালো মা-লা...। ঠাকুরঝির নামটি জানা হয় নি। গলাটি মিষ্টি। কিন্তু তারের যন্ত্রে বাঁধা সে সুর নয়। সেদিন শুনলাম ওর কাছে, ছেলের কঠিন অসুখ, তাই আসতে পারছে না। ডাক্তার-ওষুধে ওর সোনার একটি বালা বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। ছেলে এখন একটু ভাল আছে। আর কটা দিন পরেই মনে হয় কাজে আসতে পারবে। আসতে যে তাকে হবেই। ছেলেকে ঠিকমত বড় করতে গেলে অনেক অ-নে-ক টাকা তার চাই।

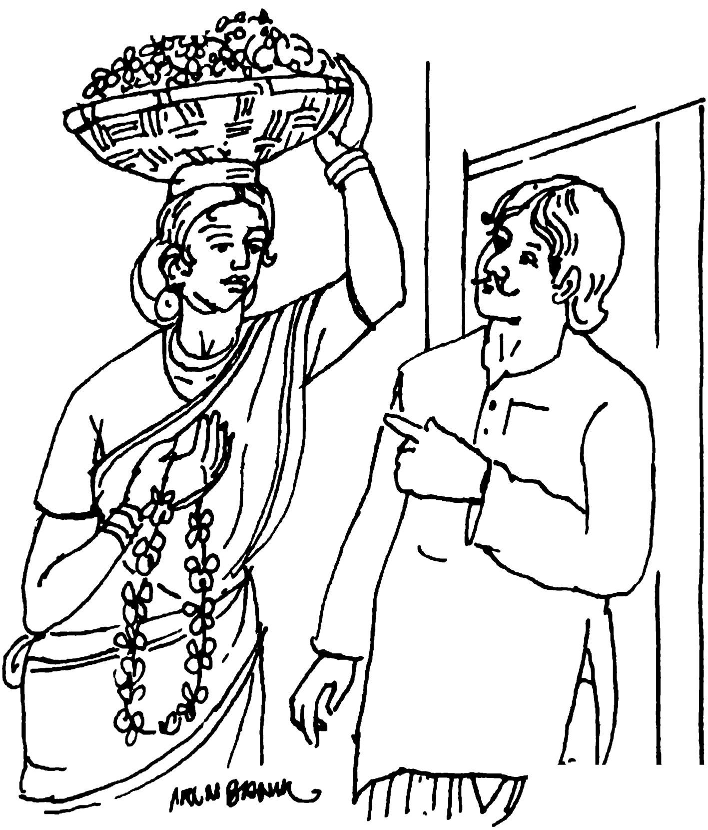
দু'সপ্তাহ বাদে সুমনা আবার তার ফুলের মালার পসরা নিয়ে হাসিমুখে ঘর থেকে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু দু'বছর বাদে আর ওদের দু'জনের কাউকেই দেখা গেল না।

হঠাৎ একদিন বনগাঁ লোকাল ট্রেনে বিনয়রঞ্জন দেখা পেলেন সুমনার। সঙ্গে দুই মহিলা ও একজন পুরুষ। কলকাতার কোনও হাসপাতালে যাচ্ছে পায়ের চিকিৎসার জন্য। ভ্যানে করে ফুল নিয়ে সকালে আসার পথে একটি অটোর ধাক্কায় পিছনে পা ঝুলিয়ে বসা সুমনার পা ক্ষত-বিক্ষত হয়। ডান পায়ের একটি অংশের হাড় ভেঙেছে। এর আগে দু'দিন আর.জি.কর-এ গেছে। আজ আবার দেখাবার দিন। আজই নির্ধারিত হবে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে কি না।

দেখা হতেই খুশীতে ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিনয়রঞ্জনকে বসাবার জন্য ব্যস্ত হয়। তিনি নিষেধ করেন। সুমনা বলে 'মেসো, ভাল আছ? ঘাড় নেড়ে 'ভাল' বলেই বিনয় পাল্টা প্রশ্ন করেন 'তুমি কেমন আছ? অনেক দিন দেখি না!' ও হেসে উত্তর দেয়, 'ভাল'।

ওর স্বামী হেসে আমার দিকে চেয়ে বলে 'কেমন ভাল, দ্যাখ্‌তাছেন তো? পায়ের যন্তন্না নিয়া কয় সাতদিন বাদেই ও মালা বেইচবারে যাবে।'

শুনলাম মালা বিক্রী ও বন্ধ করে নি। এতদূরে আসতে পারে না—বারাসত এলাকাতেই ফেরি করে। ও জানাল, ভালই চলছিল ব্যবসা। হঠাৎ দুর্ঘটনাতে পা অচল না হলে রোজগার বন্ধ হত না। নিজেই জানায় দিন সাতেক বাদেই কাজে যাবে—বিনয়রঞ্জনের দিকে চায় সমর্থনের আশায়—'কি মেসো, সাতদিনে চলতে পারব না?' বিনয় ওর মনের ইচ্ছাটি বুঝে সমর্থন জানান 'পারবে—তুমি ঠিক পারবে।' বিনয় চিন্তিত হন—তাঁর মনে পড়ে যায় সুমনার গয়না বন্ধকের কথা। সে দেনা শোধ করে গয়না ফেরাতে পেরেছে কিনা কে জানে? একটু ভেবে বিনয়রঞ্জন ওদের দিকে চেয়ে বলেন, 'দেখ, মেসো যখন ডেকেছ, এই চিকিৎসায় আমি কিছু দিতে চাই, নিতে হবে কিন্তু। আমি যাব তোমাদের বাড়ি। দাঁড়াও ঠিকানাটা



লিখে নিই।' বিনয় দত্তপুকুরের ওদের ঠিকানাটা লিখে নিলেন। পরদিন সকালেই বাড়ি খুঁজে পেলেন। হাসপাতাল থেকে ডাক্তাররা জানিয়েছেন—তিন দিনের মধ্যেই অস্ত্রোপচার করে পায়ের হাড়ের চিকিৎসা করতে হবে। বেশ কিছু টাকার ধাক্কা। এই অবস্থার মধ্যেও সেদিন বিনয়রঞ্জনের অভ্যর্থনা-আপ্যায়নের আয়োজন দেখে শেষ পর্যন্ত কঠোর হয়েই বলতে হ'ল, 'আজ শুধু চা খাব, সুমনা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে যা খাওয়াতে চাইছিলে সেইদিন খাব।' টাকাটা নিতে প্রথমে ইতস্তত করে ওর স্বামী। পরে বলে, 'দেখ তোমার টাকা আর-বছবের আগে দিবার পারুম না।' বিনয় বোঝান 'এ টাকা শোধ দিতে হবে না। তোমাদেব মেসোর টাকা আবার শোধ দেবে কী! আর মেসো অসুবিধা করে তোমাদের কিছু দিচ্ছে না।' অনেক বোঝাবার পর টাকাটা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে বারবার প্রণাম করে আর বলে 'মেসো নও, তুমি দ্যাব্‌তা গো!'

এক মাসের কিছু বেশীদিন পর সুমনা এসেছিল বিনযরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে ঠাকুরঝিও ছিল। সাতদিন পর বিনয় যাবেন বলে কথাও দিলেন। বাড়িতে সকালেই আত্মীয় এসে পড়ায় যাওয়া হয়নি। অবশ্য ভোরবেলাতেই সুমনার পরিচিত এক বাড়িতে ফোন করে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। সাতদিন পরে বিনয় সত্যিই উপস্থিত হয়েছিলেন। শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, পাশের কোন্ বাড়ি থেকে একটি হারমোনিয়াম জোগাড় করে এনেছিল ওরা। রীতিমত গানের জলসাই বসে গেল সেদিন। পাড়ার ছোট-বড় বেশ কিছু মানুষ গান শুনতে হাজির সুমনাদেব বাড়ির উঠানটাতে। তুলসী মঞ্চটির সামনে গোবর দিয়ে লেপা সুন্দর পরিচ্ছন্ন উঠানটায় গোধুলির ম্লান রক্তিমাভা আম আর জাম গাছটার উপর এসে পড়ে। শিমূল গাছটি সেদিন তার আনন্দের সবটুকু আভা উজাড় করে দিয়েছিল।

দু'মাস বাদে একদিন সমীরকে নিয়ে সুমনা এল। একটা থলিতে নিজেদের গাছের কয়েক ছড়া কলা এনেছে। সমীর কলা বার করে বলল—ভাল কলা, স্যাবা করেন যানি কত্তা।' সুমনাও হেসে খাবার অনুরোধ জানায়।

দু'জনেই ঢিপ করে পায়ের কাছে মাটিতে প্রণাম করে।

বিনয় গান শুনল কিছুক্ষণ। এবার গাইতে বলে সুমনাকে। সুমনা লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে বলে 'শিখি নাই তো গান।' বিনয় অভয় দিয়ে বলেন, শেখা লাগবে না, যা পারো খানিকটা শোনাও।'

সুমনা শুক-সারীর গান শোনায়। বিনয়রঞ্জন অবাক হন। গলায় সুর তো তৈরী হয়েই আছে। একে প্রকৃতির দান বলাই ভাল। দোয়েল-কোয়েলের গানের মতই আপনিই সুর ঝরছে।

ওর গানের শেষাংশে একটু হারমোনিয়াম বাজিয়ে দেখলেন গলা প্রায় সুরেই

আছে। বিনয় বললেন, তুমি ত গান জান মা, তোমায় আমি শেখাব। ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়। আর একবার প্রণাম করে অভিভূত হয়ে।

সুমনা গান শিখেছিল বিনয়রঞ্জনের কাছে প্রায় দু'বছর। তারপর সংসারের চাপে আর শেখা হয়ে ওঠে নি। আরো কিছুকাল শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু ছেলে পারিজাত নবম শ্রেণীতে উঠতেই পড়াশুনার চাপ বাড়ল। আরো বই, আরো টিউটর চাই। শুধু মালাতে কুলোবে না। তাই সেলাইয়ের মেসিন কিনে নানান রকম পোশাকের পার্টস্ সপ্তাহে চার ডজন করে পাঠাতে হচ্ছে বারাসতের একটি বড় বস্ত্র-ব্যবসায়ীকে। সংসারের নিত্যকর্ম করে বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে দিনরাত এ কাজ করতে হয়। আশ্বিনের শুরু থেকে পূজা উপলক্ষে তাকে বেশী খাটতে হয়। সপ্তাহে একশ' টাকা—ওর বিবেচনায় ভালই। ফুল ও সেলাই মিলিয়ে মাসে প্রায় দু'হাজার টাকা হয়। এরপরও সুযোগ পেলে বিশেষ বিশেষ উৎসব-পার্বণে অতিরিক্ত কিছু উপার্জনও করে।

বিনয়রঞ্জনের খুবই কষ্ট হয় সুমনার অবস্থা দেখে। মাঝে মাঝে সে ভেবেছে অন্তত সেলাইয়ের কাজটা বন্ধ করা যায় ওকে মাসে পাঁচশ টাকা করে দিতে পারলে। কিন্তু পেনসনের আর গান শেখানোর সামান্য টাকা থেকে ঐ অতিরিক্ত টাকার ঝুঁকি নিতে সে সাহস করে নি। একটি মাত্র সন্তান হলেও সম্প্রতি বিদ্যুৎ-টেলিফোন-কেবল্-জেনারেটর-দু'ধের মাসিক ব্যয়টা নিতান্ত কম নয়। তাই বিনতাকে আর এ নিয়ে কিছু বলেনি। একদিন শুধু একটু যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গান থামিয়ে বলেছিল 'সুমনা গানটা ছেড়ে দিল—আমি তো ওকে বিনা বেতনেই শেখাচ্ছিলাম। অমন গলা... আর ক'টাদিন শিখলে ও একটা জায়গায় পৌঁছত গো!' বিনতা মনোযোগ দিয়েই শোনে বিনয়ের কথাগুলি। তারপর চায়ের শূন্য কাপ ডিশ তুলে নিতে নিতেই বলে 'কী করবে বল, ছেলেটাকে তো আগে মানুষ করতে হবে!'

পারিজাতের মাধ্যমিক পাসের খবরটায় বিনয় খুশী হয়ে মা ও ছেলের শুভকামনা করলেন। স্টার মার্ক পাওয়া ওর মত সংসারে বিশেষ কৃতিত্বের বৈকি! বই কেনার জন্য পাঁচশ টাকার একটি নোটও দিলেন। সুমনার মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু পরক্ষণেই যেন খুশীর ভাবটা কোথায় মিলিয়ে গেল!

মাস তিনেক বাদে বিনয় দত্তপুকুরে গেলেন। ওরা সকলে অবাক। সকাল বেলায় উঠোন ঝাঁট আর গোবর লেপার কাজ শেষ করেছে। উঠে হাসিমুখে সুমনা ছুটে এগিয়ে এসে প্রণাম করে। বিনয় ওদের ঘরের দাওয়ায় বসতে বসতে প্রশ্ন করেন, 'কেমন আছ তোমরা?' —'ভাল আছি গো। আপনারা কেমন?' সুমনা উত্তর দেয় কলা-মুড়ি আর দুধের দু'টি বাটি সামনে এগিয়ে দিয়ে।

বিনয় কুশলবার্তা বিনিময় ক'রে সুমনার ছেলের পড়াশুনার খবর নেয়।

পারিজাতের পড়াশুনা ঠিকমত চলছে জানাল। সকালে পড়তে গেছে ওর অঙ্কের মাস্টারমশায়ের কাছে। জয়েন্ট এন্ট্রাস দেবে সামনের বছর। উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচীর সঙ্গে তাই জয়েন্টের পড়াশুনা চলছে। বেলা সাড়ে দশটা বাজে। এবার বিনয়কে উঠতে হল। বারোটার আগে বাড়িতে পৌঁছতেই হবে। আবার আসার জন্য করজোড়ে অনুনয় জানায় সুমনা। চলে আসার সময় বিনয় জিজ্ঞাসা করে 'সমীর মাঠ থেকে ফিরল না তো।' সুমনা জানায়, 'উকিলবাবুর বাড়ি গেছে— সেখান থেকে বারাসত কোর্টে যাবে।'

বিনয় হতবাক হয়। কোর্টকাছারী কেন? খুন-খারাবি নয় তো!

সুমনা একটু হেসেই বলে 'না, তেমন কিছু নয। ধানের জমির সীমানা নিয়ে একটু গণ্ডগোল আর কি!'

পরে একদিন সমীরের কাছে সব শুনে বিনয় স্তম্ভিত। বছর দেড়েক হল মামলা চলছে। ওর জমির কাগজপত্র ঠিকমত থাকলেও ষড়যন্ত্র করেই এই মামলা। ও জানাল আর তিন মাসের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে ওর উকিলবাবু জানিয়েছেন। উকিলবাবু বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই। সমীর জিতবেই।

সুমনার গলার একমাত্র হারটি বন্ধক রেখে মামলার খরচ মেটাতে হচ্ছে। এতবড় বেদনার ব্যাপারটা কিছুই বিনয়রঞ্জনকে জানায়নি। সমীরের কাছে শুনলেন—সুমনা বলেছে, কোনো চিন্তা নেই, তুমি উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বল। আমি টাকা আনব। সুমনার পরামর্শ-মতো টাকা জোগাড় হয়েছে। প্রতিমাসে একশ টাকা করে দিয়ে গেলেই চার বছরের মধ্যে নাকি দেনা পরিশোধ হবে।

বিনয় অনায়াসেই বুঝতে পারেন, পারিজাতের জন্য একটু ভাল মাছ-দুধ-ঘি-মাখনের ব্যবস্থা রেখে নিজেদের যা-হোক শাক-ভাতেই অনেকদিন চালাতে হয়েছে সমীর-সুমনাকে।

ভাল আছে সুমনা। আশ্বিনের পুজো পার হতেই বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছিল। অঘ্রাণে কী এক ব্রত পার্বণ আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। অনুষ্ঠান-দিবসের কাছাকাছি একদিন এসে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

ব্রত-পূজা-গানে-পূজার প্রসাদে আনন্দের বন্যাই বইল সেদিন। অনেকের গানের মধ্যে বিনয়রঞ্জনকেও গাইতে হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন আলাপে-হাসি-আনন্দে সারাদিন কাটায়। ছোটরা উৎসব-অঙ্গনে খেলায় মাতে। বিনয় জেনেছেন এবারের এই ব্রতপার্বণে সুমনার বিশেষ প্রার্থনা ও সঙ্কল্প ছিল জমির মামলার নিষ্পত্তি।

জীবনে অনেক বঞ্চনা, অনেক গঞ্জনা—তবু ভাল আছে সুমনা। বিনয়রঞ্জনের সান্ত্বনা—দারিদ্র্য যতই আঘাত হানুক, সুমনা আছে, তাই পারিজাতের সৌরভ একদিন মাতাবেই সকলকে।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

মালতীর সংসার

খাস কলকাতার বিশ কিলোমিটারের মধ্যে নিকুঞ্জপুরের মত শহরতলী আজ এত মানুষের কর্মব্যস্ত স্থান হয়ে উঠবে, কেউ ভাবতেও পারে নি। স্বাধীনতালগ্নে দেশবিভাগের ফলেই উদ্বাস্তু হিন্দুর দল আশ্রয়হীন অবস্থায় তাঁবু খাটিয়ে জীবনযাত্রা নতুন করে আরম্ভ করে। পরে সবাই আশি/একশ টাকা চাঁদার বিনিময়ে পাঁচকাঠা করে প্রত্যেকে জায়গা পেয়েছে। ঘর হয়েছে কারো পাকা, কারো বা মেঝেটাই শুধু পাকা। আবার কারো ভাগ্যে তাও জোটেনি। রামমণি বৃদ্ধ পিতামাতা সহ পাঁচ বছরের কন্যা ও তিন বছরের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এই উদ্বাস্তু আশ্রয়ে আসেন। তখন জ্যাঠতুত খুড়তুত ভাইয়ের সঙ্গে তার নিজের দুই ভাই, এক বোনও আসে। সকলেরই লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হয় তাকে। এক ভাই অবশ্য দু'বছরের মধ্যে একটা কাজ জুটিয়ে নেয় পড়া ছেড়ে দিয়ে। রামমণি বলেছিলেন একবছর বাদে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাটা দিয়ে কাজ করতে। কিন্তু সংসারের কথা চিন্তা করে সে তা শোনে নি। অপর ভাই বি.কম. পাশ করে একটা চাকরী পেয়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই বোনটির বিবাহের ব্যবস্থা সে করেছিল। নিজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রোজগার করেছে। বাঁশ-খুঁটি-বেড়া-টালি-টিনের ঘর তৈরী ছাড়াও টুকটাক কাঠের আসবাব মেরামতের কাজ সে করেছে। কিছু পয়সা জোগাড় করে যন্ত্রপাতি কিনে বাদ্যযন্ত্রের নানা অংশ তৈরীর কাজে একসময় সে ভাল বাজার পেয়েছিল। বেহালা, এস্রাজ ইত্যাদি যন্ত্রের কাঠের এক একটি অংশের সে ভাল অর্ডার পেয়েছে—উপার্জনও ভালই হয়েছে। কিন্তু সংসারের ব্যয়ভার বাড়ল—অসুখ-বিসুখে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে পুঁজি ভেঙ্গে দিন চালাতে হল। ও ব্যবসা বন্ধ। মা-বাবাকে সাধ্যমত সুখে রেখে সেবাযত্ন করতে পেরে ও নিজে খুব খুশী হয়েছিল। এদেশে পনেরো-বিশ বছর ওরা বেঁচে ছিলেন। পরিণত বয়সেই ওঁদের দেহাবসান।

রামমণি শুধু নিজের সংসারটাই দেখেনি; জ্যেঠতুত, খুড়তুত দুই ভাইয়ের চার বছরের পুরো পড়ার ব্যয়ভারও স্বেচ্ছায় বহন করেছে। সবই সম্ভব হয়েছে তার সৌভাগ্যলক্ষ্মী মালতীর জন্য। মালতীরই প্রেরণায় এসব কাজ সে করতে পেরেছে। নিজেদের খাওয়া-পরা কিছুটা কাটছাট করেও তাদের দেখেছে। একই

জমিতে পাশাপাশিই ওদের ঘর। মাঝে-মধ্যে কোন ঘরে চাল নেই দেখে ছুটে গিয়ে ব্যবস্থা করেছে খাওয়ার। কিন্তু এত করলেও, সেই জ্যাঠতুত খুড়তুত ভাই আর তাদের বৌয়েরা মিলে আজ তাদের উৎখাত করার এমন চক্রান্ত করবে—এ তারা কোনদিন ভাবতেও পারেনি। মালতী দীর্ঘ সাত বছর হল পায়ের ব্যথায় ও অন্যান্য অসুখে চলার শক্তি হারিয়ে শয্যাশায়ী। নাতি-নাতনি নিয়ে খুবই কষ্টে দিন চলে। নাতি শঙ্কর সামান্য বেতনের একটা কাজ পেয়েছে। তার ছেলে বি. এ. পাশ করেও কাজ পায়নি। তাই রামমণির কাছে শেখা কাঠের কাজ অল্প-স্বল্প করে ওদেরই এক জ্ঞাতির কারখানাতেই। মজুরী সামান্যই জোটে। নাতনি মঞ্জরী, বি. এ. পাশ করেছে। বেশ কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে সংসার চালায়। চাকরীর জন্য খুব চেষ্টা করছে। এখনও কিছু পায়নি। এখানকার বেশ কয়েকটা ছোটদের স্কুলে চেষ্টা করেছে—সহৃদয় দু'চারজনকে জানালেও তাঁরা এখনও কোন হদিশ দিতে পারেন নি।

জ্যাঠতুত ভাই দিনেশ সেদিন কোথা থেকে এক উকিল জুটিয়ে এনে বলে, 'দাদা, জমিটা প্রত্যেকের নামে আলাদা করে রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে। ইনি এ বিষয়ে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রীতেশ আর তোমার দেড় কাঠা করে, আমার সংসার একটু বড় বলে দুকাঠা হবে আমার নামে। পিছনে জড় হওয়া পরিবারের সবার দিকে চেয়ে বলে, তোমরা কি বল? সমস্বরে সকলের দ্রুত উত্তর 'হ্যাঁ হ্যাঁ' এটাই ঠিক।'

উকিলবাবুকে মালতীর কাছে আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্বামীর নামের জমি এরা সকলে যেভাবে ভাগ করলেন তাতে আপনার আপত্তি নেই তো? মালতী বলে, 'সম্পত্তি ভাগে সবাই যা মেনে নেয় তাতে আমার অমত নেই। কেবল মানুষ ভাগেতেই আমার আপত্তি। সবাই যাতে দুটো খেতে পায় আর মাথা গুঁজবার জায়গাটুকু পায়—এইটুকু হলেই হল। 'ঠিক আছে তাহলে সবাই স্বাক্ষর করুন। আমি আর একবার পড়ে শোনাই। তারপর আপনি স্বাক্ষর করবেন। মঞ্জরী এতক্ষণ বাড়ি ছিল না। সে এসে সব শুনে জানাল দু'দিন বাদে স্বাক্ষর করা হোক। কেননা, কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চায় সে।

মালতী দুই কিলোমিটার দূরে স্বামী স্বরূপানন্দ মন্দিরের বৈকালিক উপাসনায় দীর্ঘকাল যোগ দিয়েছেন। মন্দিরের শ্রীদুর্গা ও অন্যান্য পূজায় অংশ নিয়েছেন নিয়মিত। ভক্তিভরে গান শুনিয়েছেন কত! গুরুদেব দেহ রাখার পরও বছর পনেরো হল। নিজে আসতে না পারলেও মেয়ে বা নাতি-নাতনিকে পাঠান মন্দিরে প্রণাম করবার জন্য। সঙ্কটে প্রণাম অপেক্ষা সঙ্কটমোচনে প্রণামে তাকে বেশী বিহ্বল হয়ে পড়তে দেখেছি। চোখের জল বাঁধ মানত না। গুরুদেবের মধুরবচনে আশীর্বাদে শান্ত হতেন। মালতীদেবীর বাড়ির সকলের প্রণামের ভঙ্গীটি

হল পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণত হওয়া। লোকজন কম থাকলে মন্দিরে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন।

গুরুদেব ওর কাজের ভক্তিনিষ্ঠায় খুব খুশী হতেন। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা বলতেনও, কষ্টের সংসারে নুন-ভাতটুকু জুটলে ভাল, না জুটলেও উপোষ দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন রামমণি-মালতীর পরিবার। কিন্তু ভদ্র পরিবারের পরিবেশটুকু নষ্ট করে মধ্যে দিনেশ যেভাবে দলবল জুটিয়ে এনে তাসের আড্ডা বসায়, তা সহ্য করা রামমণি-মালতীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ওদের বে-সামাল কথাবার্তা কানে আসে। পড়াশুনার পরিবেশ উধাও হয়। এক-একদিন এমনও ভাবতে বাধ্য হয়েছে রামমণি যে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকে। দিনেশরা সেটাই চেয়েছে— মুখেও তাদের সেকথা প্রকাশ পেয়েছে। এইতো সেদিন সাতটি ছেলেমেয়ে পড়তে এসেছে। মঞ্জরী ওদের ঘরের সামনের বারান্দায় ঠিকমত পড়াতেই পারছে না



দিনেশের আড্ডার হৈ-চৈ-এ। একটু আস্তে কথা বলার অনুরোধ জানাতেই কত কথা শোনাল—'তোমাদের জন্য কি দিনরাত আমরা মুখ বুজে পড়ে থাকব? একটু কথা-গল্পও করতে পারব না? অত ডিসিপ্লিন রাখতে হলে আর কোথাও ঘর করে থাকতে হয়।' বৌদির শেষ কথাটির শ্লেষ সহ্য করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মঞ্জরী পড়া বোঝাতে থাকে।

এমন ঘটনা সাত বছর ধরে চলছে। মঞ্জরী পড়াতে বসলে ওদের অত্যাচারের মাত্রা যেন বেড়ে চলে। পড়িয়ে অর্থ উপার্জনটা বুঝি ওদের সহ্য হয় না— দেখে-শুনে সেইরকম মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

সঞ্জয় দাশ এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ। মঞ্জরী একজন সহৃদয় ব্যক্তির কাছে তাঁর সন্ধান পেয়েছে। তিনি সব শুনে বললেন, 'ওদের দলিল আমাদের দেখাতে হবে। আমাদের তৈরী দলিলটিও ওরা দেখবেন। তারপর তাতে স্বাক্ষর হবে। একথা জানানো মাত্রই দিনেশ বলল, 'দলিল এখনও তৈরী হয়নি। হলে দেখাব।' ব্যাপারটাতে বেশ বোঝা গেল তার আনা উকিলবাবু যে দলিল তৈরী করে এনেছিলেন তাতে এমন কিছু ছিল, যা রামমণি বা তাদের কারও পক্ষেই মেনে নেওয়া চলে না। নতুবা অতটা এগিয়ে পিছিয়ে যাবার কারণ কি? প্রায় বিশ বছর আগের কথা। মালতীর নাতিটি নিউমোনিয়ায় মুমূর্ষু। অনেক ছোটাছুটি করে ভাল ডাক্তারের কাছে নেওয়া, কলকাতার হাসপাতালে সীট্ যদি বা পাওয়া গেল, তা আবার 'পেয়িং বেড্'। কোথা থেকে কে কিভাবে যে এ চিকিৎসা চালাল, রামমণি তা বুঝে উঠতেও পারল না। নাতনীটির বিয়ের জন্য রাখা নিজের হার আর চুড়ি থেকে দু'গাছা বিক্রী করে মালতী অর্থ সংগ্রহ করেছিল। উপস্থিত বুদ্ধি আর দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে মালতীর বড় একটা ভুল হয় না। নাতিটি বেঁচে উঠল। ডাক্তারের মতে জীবন ফিরে পেল।

আত্মীয়-প্রতিবেশী সবাই মালতীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও সে কিছুতেই তাঁর বা ডাক্তারের চেষ্টাতেই একাজ সম্ভব হয়েছে বলে মনে করে না। মালতীর প্রতিটি কাজের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তার গুরুদেব। সাধক সিদ্ধপুরুষ। বাইরে থেকে তাঁকে আলাদা করে চিনবার উপায় নেই। না পোশাকে, না ক্রিয়াকাণ্ডে। কোন আড়ম্বর নেই। অতি সাধারণ, অতি সহজ। মধুর সে সম্পর্ক। সবাই তাঁকে চিনতে পারে না। মালতী চিনেছে অনেক আগে। আর তাঁকে ছাড়েনি একটি দিনও। তাই সে অনায়াসে বলে 'বাঁচিয়েছেন আমার গুরুদেব— সাক্ষাৎ ভগবান'—বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলে। নিজেকে সামলাতে সময় লাগে। এ দৃশ্য কতবার আমি দেখেছি। এ বিশ্বাস— এ গুরুনিষ্ঠা মিলবে কোথায়! মালতী কেমন আছেন জানতে চাইলে হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে প্রসন্নবদনে বলেছেন 'খুব ভাল রেখেছেন গুরু।'

যাওয়া-আসার পথে তাঁর যেটুকু খবর রেখেছি তা নগণ্য। গুরুদেবের তিরোধানের পরে তার বাড়ির নাতি-নাতনির বেশ কিছু খবর জেনেছি। চাকরীর জন্য একটি বিশেষ পরীক্ষার পড়া বুঝতে এলে তাঁর নাতনীব কাছে কিছু কথা শুনলাম। নাতি-নাতনীর জন্য অর্থের অভাবে গৃহশিক্ষক রাখতে পারেন নি। অথচ একদিনের জন্যও তা আমাদের জানায়নি। একটু সাহায্য পেলেই এরা পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারত। জেনেছি অনাহারে দিন কাটিয়েও বলেছেন 'গুরু ভাল রেখেছেন।'

মুমূর্ষু নাতিকে দেখতে যাচ্ছেন। কেমন আছেন জানতে চাইলে পূর্ববৎ আনন্দে কবে কি শুভপ্রাপ্তি ঘটেছে বিবৃত করেছেন। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করেছেন গুরুদেবকে বারবার আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হয়ে। পরিচিত প্রতিবেশী কারও অসুখ বা বিপদের কথা শুনলে সবার আগে সেখানে মালতী গিয়ে উপস্থিত হয়ে করণীয় কাজে সাহায্যে নেমে পড়েছেন। আজ শয্যাশায়ী মালতীর কণ্ঠে অবিরাম সেই গুরুবন্দনা। ওঁর গুরুভগ্নীদের কাছে শুনি কত দিনের স্মৃতি। গুরুকৃপাব কথা আব কান্না—এই তাঁর সম্বল।

গত রাত্রে জন্মাষ্টমী তিথির পূজা শেষ হয়েছে পাশের মন্দিরে। পূজা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন মালতী নাতনীকে দিয়ে। মন্দির থেকে ফিরে এলে প্রসাদও সবাই পেয়েছে। কিন্তু বেশীরাত্রে মালতীর শরীরটা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। আজ সকালে ডাক্তার এসেছেন। অবস্থা ভাল নয়। দেহের এ অবস্থায় দূরের হাসপাতালে নেওয়া চলবে না। তাই বাড়িতেই সাধ্যমত চিকিৎসা চলছে।

মালতী গুরুনাম করছেন শুধু শয্যায় শুয়ে। হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করেন — কান্নায় ভাসে আকুল কণ্ঠ—সবাই এল, দিনেশ তো এল না একবার।' রামমণি ও ডাক্তারবাবু শুইয়ে দেন। শান্ত হতে বলেন। দিনেশ কাছে আসে। মালতী হাত বাড়িয়ে বলে, ঠাকুরপো এসেছ; কই হাতটা দাও। আমার সোনামণিদের দেখো— আমার যাবার সময় হয়েছে। তোমাকেই তো ওদের দেখতে হবে। মালতী হাতটা ছেড়ে দিনেশের নতমস্তকের উপর ক্ষণিকের জন্য রেখে দু'হাত জোড় করে গুরুমন্ত্র স্তব করে কম্পিত কণ্ঠে। কার কণ্ঠের গীতার শ্লোক ভেসে আসে—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।'

দেহ চির-স্থির হয়। কান্নায় ভেঙে পড়ে সবাই। দিনেশ চোখ মুছতে মুছতে মঞ্জরীকে বলে—'ওরে, জমি ভাগ আর চাই না।' রামমণি জড়িয়ে ধরেন ভাইকে।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

মঞ্জুরাণীর কথা

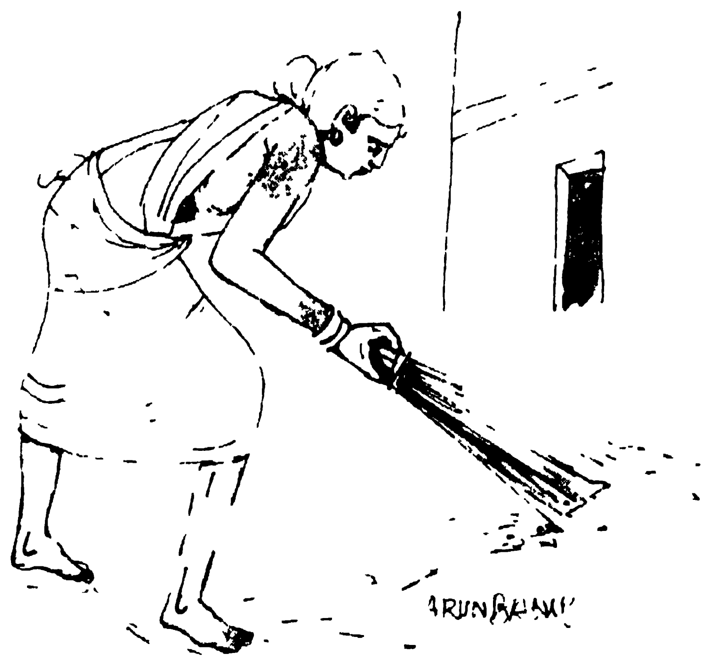
সাজিরহাটের শহীদবন্ধু নগরের মঞ্জুরাণীর বয়স সত্তর পার হয়েছে। এখনো কাজ করে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে সে আমাদের বাড়িতে কাজে আসে। একনাগাড়ে বিশ বছর কাজ করার পর সে কাজ ছেড়ে দেয়। শারীরিক কারণেই এই কর্মবিবতি। এরপর তার মেয়ে সবিতাই কাজ করেছে! বছর দশেক কাজ করে সেও অবসর নেয়। শুনলাম সবিতার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়েছে। সে লোকের বাড়িতে আর কাজ করবে না। শুনে ভাল লাগল। সবদিক থেকে (রূপেগুণে) ভাল ওই মেয়েটির কপাল খারাপ। নইলে চার বছর ধরে নির্যাতন সয়েও সে স্বামীর ঘর করতে পারল না। দিনের কাজ শেষে নেশা করে এসে স্ত্রীকে মারধোর ছিল তার স্বামীর নিত্যকর্ম। সংসারে অভাব তো লেগেই ছিল। মায়ের কাছ থেকে প্রায়ই টাকা ধার নিতে হত। মাঝে মাঝে সে নিজে এসেও মঞ্জুরাণীর কাছে টাকার জন্য হানা দিত। নিজেরা অনাহারে থেকেও তখন তার কষ্টার্জিত সামান্য টাকা জামাইকে দিতে হত। পরে পাকাপাকি বিচ্ছেদ হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিবাহের পর শুনেছি সবিতার কষ্ট কিছু দূর হলেও সংসারে শান্তি আসেনি। তার স্বামী অমর ভ্যান-রিক্সা চালায়। রোজগার মোটামুটি খারাপ না হলেও হিসেবী নয়। রোজগারের সব টাকা ঠিকমত সবিতাকে দেয় না। এদিকে সবিতাকে লোকের বাড়িতে কাজ করতে দিতে চায় না। একটু লেখাপড়া জানে—এইচ্. এস্. পাশ। মনটি ভাল। মেজাজ একটু আছে। মাঝে মাঝে ঝামেলা হয় শুনেছি। তিন বছরের ছেলেটিকে নিয়ে ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে চলছে তার সংসার। দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে নিকটে, মধ্যমগ্রামেই। মাঝে মাঝে মাকে দেখতে আসে, মঞ্জুরাণীও তাদের বাড়ি যায় এটা-ওটা নিয়ে।

সবিতা সবসময় মাকে দেখে। বাবাকে হারিয়েছে পাঁচ বছর বয়সে। মা-ই তাকে মানুষ করেছে অনেক কষ্টে। এ ব্যাপারটা সে ভুলতে পারে না। অনটনের মধ্যেও বছরে দুই-একবার শাড়ী ইত্যাদি এনে হাজির করে। একবছর কিছু দিতে না পারায় এসে কান্নাকাটি করে গেছে। মঞ্জুরাণী কত বোঝায় তাকে, তার কাপড় আছে—অসুবিধা কিছু নেই। তবু সে তা শুনতে চায় না।

একথা সত্য, সবিতার সংসারের খবচ বেড়েছে। বছর চারেক হল মাকে সে কিছু দিতে পারছে না। মঞ্জুরাণী কাজ ছেড়ে দেবার পর পুরানো বাড়িগুলির তিন জায়গায কাজ ধবেছে নতুন করে। আমাব এখানেও সে সকালে এসে বাসন মাজে, ঘর-দুয়ার-উঠোন ঝাঁট দেয়, ঘর মোছে, প্রয়োজনবোধে গেঞ্জি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়-ঢাকনা ইত্যাদি সাবান-কাচার কাজও করে দেয়। কতই বা পায় বেতন—মাসে দু'শ প্রায়। ওর সুখ-দুঃখে দীর্ঘকালই আমরা জড়িয়ে গিয়েছি। তাই ওর দুঃখ-বিপদ কিছু অংশে আমাদের দুঃখ-বিপদ হয়ে উঠেছে।

শহীদবন্ধু নগরে ওর মাটি-বেড়ার ঘর—টালির চাল। কতবার যে ঝড় গর্জে এসে ওর ঘব ভেঙে দিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। আজও তার ঘরের বেড়া ভাঙা শালের খুঁটি আছে ছয়টি, বাকি সবই বাঁশের খুঁটি। এই তো গতমাসে সে খুঁটি পাল্টাবার জন্য একসঙ্গে কিছু বেশী টাকা চাইল। কযেক মাসের বেতন না নিয়েই সে ওই টাকা শোধ করছে। অবাক হতে হয় মঞ্জুরাণীর সততা, নিষ্ঠা দেখে। খেটে-খাওয়া এই মানুষদের শ্রমই বাঁচার পথ। কিন্তু দারিদ্র্য কঠোর হয়ে কোন কোন মানুষকে পবিবর্তিত করে। লোভ সেখানে বড় হযে ওঠে। কিন্তু মঞ্জুরাণীর জীবনে



দীর্ঘকাল ধরে দেখছি একটুও প্রলোভন প্রকাশ পায় নি। হাতে করে কিছু দিলে তবে সে তা গ্রহণ করেছে। অসংখ্যবার ঘরে টাকাপয়সা, মূল্যবান বা তুচ্ছ জিনিস—যাই থাকুক, সে স্পর্শ করে নি। ওর কন্যা সবিতা খুবই চট্‌পটে, স্বভাবে ওর মতই সরল ও সৎ। সেও একইভাবে ঘরের কোন জিনিসে হাত দেয় নি।

পূর্বে ছিল একান্নবর্তী পরিবার। এখন যে ঘরে আছি, সেখানে আমি একা। অনায়াসেই উপর-নীচ যে কোনো ঘরের কাজ মঞ্জুরাণী একাই সম্পন্ন করে। অনেকবার দেখেছি, ভাঙা বা পরিত্যক্ত একটা স্টোভ, কড়াই ইত্যাদি আমার কাজে লাগবে কি না বা বিক্রী করব কিনা জিজ্ঞাসা করছে। এমন মানুষকে কিছু দেবার জন্যও আমাদের মন হয় না! কাজের লোক সবাই মাসে তিন-চার দিন অলিখিত ছুটি আজকাল প্রায় বাড়িতেই করে নিয়েছে। মঞ্জুরাণী এখানেও তা করে। আগে জানিয়ে অনুপস্থিত হ'ত, এখন না জানিয়েই কামাই করে। কিন্তু দু'মাস আগে সে একনাগাড়ে দশদিন কামাই ক'রে বসল। নতুন লোক সন্ধান করছি কাজের জন্য। এমন সময় একদিন এসে হাজির।

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করি অসুখ-বিসুখ করেছিল কি না। ও জানাল, না, অসুখ করে নি। ওর ছোট মেয়ের এক দুর্ঘটনায় পা ভেঙেছে। বর্ধমান জেলার বৈঁচি গ্রামের একপ্রান্তে থাকে। ভ্যান-রিক্সার সঙ্গে মোটর সাইকেলের ধাক্কায় ভ্যান থেকে পড়ে গিয়েছে। ক্ষত বেশী নয়, কিন্তু বাঁ পায়ের হাড় ভেঙ্গেছে। প্লাস্টার-করা পা নিয়ে সংসারের কাজ করতে পারছে না। ছোট দু'টি সন্তানকে দেখাশুনারও কেউ ছিল না। জামাই রোজই চাষের কাজে যায়। তাই দিনদশেক তার সংসারটাকে সামলে দিতে ছুটেছে মঞ্জুরাণী।

আমি বললাম, 'খুব ভাল কাজ করেছ।' মনে মনে বললাম, 'কিন্তু অসুস্থ তোমার সেবা করতে ওদের এখানে পাবে কি?' বললাম, এই তো ক' মাস আগে সাতদিন জ্বরে ভুগলে। সবিতা কাছে আছে বলে দুদিন তোমার কাছে এসেছিল।

মঞ্জুরাণী হেসে বলে, 'আমার কত্তব্য আমি করব, তারডা সে না করে, না করবে।' এরপর সে কর্তব্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাকে নিয়ে টানাটানি করতেই তাকে থামাই।

সেদিন মঞ্জুরাণী জানাল, কারা যেন বাড়িতে এসে সুবিধায় ঋণ বাবদ টাকা দিয়ে যায়। ওর পাশের কিছু বাড়ির লোকেরা পেয়েছে। কিন্তু মঞ্জুরাণী আবেদন করেও তা পায়নি। ওর ঘরের ভাঙা বেড়ার মেরামতির জন্য কাকুতি-মিনতিতেও কাজ হয়নি। ওরা জানিয়েছে, তার মত বয়স্কদের ঋণ দেওয়া হয় না।

বর্ষার আগে যে করেই হোক, বেড়ার ব্যবস্থা কিছু ওকে করতেই হবে। একদিন বলল, প্লাস্টিকের চাদর কিনে লাগাবে। চারদিকের বেড়ার তলার দিকে চার ফুট

চওড়া প্লাস্টিক কিনতে ওর বেশ কিছু টাকা লাগবে। আমি বোঝালাম, প্লাস্টিক বেশীদিন টিঁকবে না। তুমি যেসব বাড়িতে কাজ কর বা আগে করেছ—তাদের গিয়ে ধর। একবাড়ি থেকে সব টাকা না পাও, তিন বাড়ি থেকে বিনা সুদেই টাকা ধার পেয়ে যাবে। আমিও একটু চেষ্টা চালাব তোমার জন্য।

টাকার জোগাড় সত্যিই হয়ে গেল। দু'টি বাড়ি সাগ্রহেই টাকা দিল। কিছুকাল আগে ঐ দু'টি বাড়িতেই সে কাজ করত। একজন আমাকে ওর সুখ্যাতি করে বললেন, মঞ্জুরাণী শুধু সৎ না, ও প্রতিবেশীর জন্য বিপদে ছুটে যায়। মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচিয়েছে একটি পরিবারের সন্তানকে।

এর পরের ঘটনা—বেড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেলেও বৈশাখী ঝড়ে ঘর একদিকে হেলে গেল। দুটি শালের খুঁটি পাল্টাতে হবে—টালিও কিছু কিনতে হবে। আরো টাকা চাই। পাঁচশ টাকা পেলেই কিছু বাকী রেখে ঘর সারিয়ে নিতে পারবে জানাল আমাকে। আমার কাছে ঐ টাকা চেয়ে বলল, 'আগের মতই সে ক' মাসের মাইনে না নিয়েই ঐ টাকা শোধ দেবে। সহজ সম্মতিতে ও খুশী হল।

শ্রাবণের পর্যাপ্ত বর্ষণ শেষ হলেও ভাদ্র তার দখল-রাজ্য ছাড়তে নারাজ। তাই অবিরাম বর্ষণ দেখছি ভাদ্র শেষেও। আগস্ট মাসের প্রথম থেকেই বারোদিন হল মঞ্জুরাণীর কোন খবর নেই। ত্রয়োদশ দিবসে সে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। কথা বলতে বলতে সে বসে পড়ল দোতলার সিঁড়ির একটি ধাপে।

'কেমন আছ', জিজ্ঞাসা করতেই বলল, ভাল, ক' দিন এট্টু জ্বরে কাবুয়েরে ফ্যালেছে।' একটু দম নিয়ে বলে, 'কচ্ছি কি ছোড়দা, তোমার টাহা তো এমাসে শোধ এত্তি পারতিছি নে। ব্যারামে পড়লাম—কামাই হয়ে গেল অদ্ধেক মাস।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'এসব কী বলছ তুমি? অসুখে পড়েছ, শরীর দেখছি এখনো তোমার ভাল করে সারে নি। কাজে বেরিয়েছ এই দুর্যোগে? তিনমাসে তোমার সাড়ে চারশ টাকা শোধ হয়েছে। বাকী আছে পঞ্চাশ টাকা। ও টাকা সময়মত দিতে পার নি বলে তোমার ভাবনা? ও টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না। ওর সঙ্গে আর সামান্য কিছু যোগ করে দিচ্ছি।' বলেই ওর হাতে তা দিতেই ও অবাক হয়। বললাম, 'অন্তত আরো এক সপ্তাহ বিশ্রাম নাও। শরীর ঠিক কর।'

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মঞ্জুরাণী বলল, 'শরীল ভাল না থাক্‌লি আমাগো চলে না, ছোড়দা। মাইনে কাটে। তোমার মত সবাই তো না— বোঝ ত সবই। সংসারডা চালাই ক্যামনেরে'?

নিজের বিজ্ঞোচিত পরামর্শের জন্য একটু লজ্জিতই হয়ে পড়লাম। সত্যিই তো, 'ভাল যে থাকতে হবেই, মঞ্জুরাণীদের। নইলে আধপেটা বা অনাহারে থাকতে হবে। ঘর সারাই হবে না—বৃষ্টির জলে ঘর ভাসবে। দাঁড়াবে কোথায়? অনেকের

মুখেই শুনি, 'আজকাল নাকি সরকারের অনেক প্রকল্পে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই তা পাচ্ছে।' কিন্তু মঞ্জুরাণীর ভাগ্যে তো তা জুটল না! তবু ও ভাল আছে।

দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারলেই ও ভাল থাকে। ঘরে রাধাকৃষ্ণের পুজো করে। নিজে উপোসী থাকলেও সে ঠাকুরকে উপোসী রাখে না। ধারে হলেও বাতাসা-চিনির জোগাড় সে করবেই। গঙ্গাস্নানে যাবার ইচ্ছা খুব। কিন্তু যাতায়াতের পয়সার অভাবে সে যেতে পারে না। কেবল বছরে একবার সে যায় চাঁদপাড়ার হরিচাঁদের মেলায়।

আজও দেখি কী আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে আছে মঞ্জুরাণী আর তার মেয়ে সবিতা। আত্মীয়-প্রতিবেশী কেউ বিপদে পড়লে সবার আগে মঞ্জুরাণী ছুটবে তাকে সাধ্যমত সাহায্য করতে— কিন্তু অভাবগ্রস্ত মঞ্জুরাণী কারো হেলাফেলার অন্নগ্রহণ করে না। অনাহারে কাটাবে তবু মর্যাদাবোধ যেখানে নেই, সেখানে সে হাত পাতবে না। নিত্যই তার মুখে হাসি। বলে রাধাঠাকুরাণী তার ঘরে যেদিন ঠাঁই নিয়েছেন, সেদিন থেকে তার আর অভাব কিসের?

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

সংসারের সু আর কু

একুশ বছর পর সুনির্মলের সঙ্গে সিউড়ি শহরের ইউকো ব্যাঙ্কে ঢুকবার মুখে দেখা অনিলের। চিনতে একটু সময় নিয়েছে অনিল। চশমাটা খুলে কাছে এসে ভাল করে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে ওর কাঁধ ধরে, 'সুনির্মল যে। কেমন আছিস? কোথায় আছিস্? কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম সবাই বল্‌তো!'

একটু সময় নিয়ে সুনির্মল বলল, 'ভাল আছি, দক্ষিণ কলকাতা থেকে সিউড়িতে এখানে এসেছি দু'মাস হল। পরিবারকে আনতে পারিনি। তুই এখানে আছিস?'

সবাইকে নিয়ে আয়। ঘরের ব্যবস্থা করে দেব। আমি এখানে আছি আট বছর, সরকারী ইস্কুলের চাকরী, আমাকেও তোদের মতই আজ এখানে, কাল সেখানে করতে হয়, ভাই। তা বহুদিন পর ভগবান যখন দু'জনকে মিলিয়ে দিলেন, চলে আয় আমার কাছাকাছি। কিছুদিন থাকি পাশাপাশি। সদর ইস্কুলটার কাছাকাছি বড় রাস্তা থেকে সামান্য ভিতরে। ·কোলাহল থেকে একটু দূরেই। তোর খুব পছন্দ হবে।



সুনির্মল একটু হেসে বলে, 'আচ্ছা দেখি চিন্তা-ভাবনা করে। এখন তো ইস্কুলের বছরের প্রায় ছ'মাস হল। বছরটা শেষ করে আনাই ভাল। তা ছাড়াও কিছু সমস্যা আছে।'

'আচ্ছা, তা এখন একা আছিস কোথায়?' অনিল প্রশ্ন করে।

একা ঠিক নয়, এই ব্যাঙ্কেরই একজনের সঙ্গে শেয়ারে আছি। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাটাও একসঙ্গে চালাই, সুনির্মল সগর্বে উত্তর দেয়। —আচ্ছা ঢের হয়েছে। আর বীরত্ব তোকে দেখাতে হবে না। কালই চলে আয় আমার এখানে। একটা ঘর আমার পড়েই আছে। বিনা পয়সায় থাকতে যদি তোর আপত্তি থাকে তো আমার সঙ্গে নয় কিছু শেয়ার করিস ভাড়ার।

সৌজন্য-আন্তরিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল অনিল। সুনির্মল সেদিন সন্ধ্যায় গিয়েছিল অনিলের বাসায়। বুঝিয়ে বলেছিল অনিলকে— একা সঙ্গীকে ফেলে আসা ঠিক হবে না। অনিলও এ ব্যাপারে আর পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু সেদিনের সান্ধ্য অন্ধকারে পুঞ্জিত জীবন-স্বপ্নের অনেক টুকরো ছবি ভেসে উঠল হৃদয়-আকাশে। তার বেশীর ভাগটা ওদের জীবনে স্বপ্নই থেকে গেছে, সফল হয়নি। আজ উভয়েই পঞ্চাশের দ্বারপ্রান্তে এসে প্রাপ্তিটুকু মেনে নিয়েও নির্বাসিত করতে চায়নি কল্পনার অপূর্ণ সেই জগৎটাকে।

অনিলের সংসারে ওর মেয়েটি নবম ও ছেলেটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। বনশ্রী চাকরী পেয়েছিল মাধ্যমিক এক বিদ্যালয়ে খড়দহে। কিন্তু অনিলের বদলীর চাকরীতে তা রাখা সম্ভব হয় নি। কলকাতার বেহালা অঞ্চলে একটা ভাড়া বাড়িতে রয়েছেন অনিলের মা-বাবা ও কাকা। খিদিরপুরের শিপিং করপোরেশনের চাকরী থেকে কাকা অবসর নিয়েছেন বছর খানেক আগে। তাঁর পৃথক সংসার নেই। সারা জীবন অনিল, তার দুই বোনকে মানুষ করেছে, বিয়ের ব্যবস্থা এবং মানসিক রোগগ্রস্ত ভাইয়ের সেবায় কেটেছে তাঁর জীবন। দু'বছর হল সে ভাইও তাঁকে মুক্তি দিয়ে পরপারে প্রস্থান করেছে। মঠমিশন আর অনিলদের সংসার নিয়ে আছেন। বেশীর ভাগ দিনই বিকেল থেকে রাত্তির কাটে গোলপার্কের মিশনের বক্তৃতা-গান শুনে। বই পড়ার নেশাটাও আছে। একটু অবসর পেলেই ডুবে যান তাঁর নিজস্ব সংগ্রহশালার গ্রন্থের জগতে। অনিলের পড়াশুনা, চাকুরী, বিবাহ সবকিছুর ব্যবস্থার মূলে তার কাকাবাবু। তাই বনশ্রী স্নায়ুজনিত (রিউমেটিক) যন্ত্রণায় যেদিন থেকে অচল হয়ে পড়ল, সেদিন থেকে কাকাবাবু কেমন যেন নীরব, গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। কারো সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। দিনরাত্রিতে তাঁর বাঁধা রুটিনেই চলেন। সংসারের কথার চেয়ে সৎগ্রন্থের বচনেই বেশী আগ্রহ তাঁর। অনিলের ছেলেমেয়ে দু'টির পড়াশুনা,

দেখাশুনার যাবতীয় কাজ ওদের জন্মের পর থেকে বারো আনাই তিনি সামলাচ্ছেন। ওদের ব্যাপারে বৌমাকে কিছুটা ভাবনা-মুক্ত করতে পেরে কিছু শান্তি পেয়েছেন কাকাবাবু। ডাক্তার বছর সাতেক অনিলকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তারপর মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছে, ও রোগ সারবার নয়। তবে সারাজীবন ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা অন্তত কম রাখা যাবে।

বিবাহের পর বনশ্রীকে নিয়ে একবার অরুণাচলের অরণ্যে সবুজের দেশে খুশী জাগাতে পেরেছিল অনিল। তখন সঙ্কল্প ছিল শারীরিক বাধা না থাকলে বছরে একবার অন্তত বনে-পাহাড়ে বিশেষ করে হিমালয়ের কোলে আসতেই হবে। কিন্তু সে স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হল অনিলের। একটিই সান্ত্বনা তার। এ পর্যন্ত ছেলেমেয়ে দু'টি অন্তত নিজেরা যথেষ্ট মনোযোগী পড়াশুনায়। খুবই ভাল ফল কবছে ওরা। কেবল বিধাতাপুরুষ অনিলের সাংসারিক আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ঘোড়াটির লাগাম নিজ হাতে টেনে রেখে দিলেন।

দুঃখমন্থনজাত না হলে যে আনন্দের পূর্ণতা আসে না। অনিল এটা কিছুটা বুঝেছে বলেই কাজের মাঝে বোধ হয় একটু নির্লিপ্ত থাকতে পারে। বনশ্রী অনিলের এ ভাবটা ধরতে পারে না। সে তাই অনিলের এমন ভাবের জন্য দুশ্চিন্তা করে। গতমাসের তিন দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসে অনিল বনশ্রীকে অনেকক্ষণ ধরেই ওর শয্যাপাশে ব'সে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল—সত্যিই সে ভাল আছে। কিন্তু মনে হল না বনশ্রী খুব একটা তার সত্যতা মেনে নিতে পেরেছে।

প্রায় এক বছর হয়ে এল সিউড়িতে অনিলের চাকরীর। এর মধ্যে বার দু'য়েক তাগাদা দিয়েছে তাকে সুনির্মল ওর পরিবারকে আনার জন্য। আরো ছমাস বাদে একদিন সন্ধ্যায় সুনির্মল চলে আসে অনিলদের বাসায়। দেখে তার সঙ্গীটি দিব্যি রুটি তৈরীতে ব্যস্ত। অনিল তরকারী কেটে ধুয়ে রান্নার যোগাড় করছে। 'কিরে, কিছু সিদ্ধান্তে এলি? এভাবে আর কতকাল কাটাবি?' —অনিল জিজ্ঞাসা করে।

অনিলের সঙ্গী নির্জিত বলে উঠল, 'হ্যাঁ ভাই, ঠিকই ত। তোমার আর দেরী করা চলে না। এবার কলকাতা থেকে ওদের এখানে আন। আমারও তো বদলীর সময় হয়ে এল, আর ছ'মাস মাত্র বাকী।' ছ'মাস পরে নির্জিতের যাবার দিনটিতে সুনির্মল ওদের বাসায় এসে একরকম জোর করেই অনিলের জিনিসপত্তর ওর বাসায় নিয়ে গেল। নির্জিতকে যেতে হবে এবার কৃষ্ণনগর। সিউড়ি থেকে ও সপ্তাহে শনি ও রবি দেড়দিন বাড়িতে আসত। এখন তো আরো কাছে যাওয়ায় তাই খুশীই হল। অনিলের জন্য নির্জিত অনেক ভেবেছে। বাড়িতে সে সব সপ্তাহে যায় না। একটু যেন আপন মনে থাকতেই ও ভালবাসে। বেশী কথা ব'লে ওকে

বিব্রত করেনি কোনদিন নির্জিত। কিন্তু আজ যাবার সময় হাত ধরে বলল, ‘এবার তুমি আর দেরী করো না ভাই, নিয়ে এস ওদের। তোমার অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু যখন আছেন ভাবনা কি!’

অনিল কথার উত্তর না দিয়ে শুধু হেসেছিল। পয়লা মে ছুটির দিনে বিকেল পাঁচটায় সুনির্মল ও অনিল নির্জিতকে বোলপুরের বাসে তুলে দিয়ে অনিলকে নিয়ে একটি রিক্সায় উঠে চলে এল সুনির্মল ওর বাসাতে। একটি দিনই ওদের বাসাতে রাখতে পেরেছিল শুধু অনিলকে। পরদিন কাছাকাছি একটি বাড়িতে সুনির্মল তাকে পৌঁছে দিয়ে এল। প্রশস্ত একটি ঘর, রান্নাঘর, স্নানঘর, খাবার ঘর ও এক চিলতে বারান্দা দোতলায় আঠারোশ টাকায়, একটু কমই বলতে হবে। অনিলকে না জিজ্ঞাসা করেই একটি ছেলেকে রান্নার জন্য ঠিক করেছে সুনির্মল। বলল ছেলেটি দরিদ্র। মা-বাবাও লোকের বাড়িতে কাজ করে। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করলেই হবে। মাইনে কিছু দিতে হবে না। হাত খরচ হিসাবে সামান্য কিছু দিলেই হবে। অনিল ও শর্তে রাজী হয় নি। সে বলেছে খাওয়া-পরা বাদে সে প্রতিমাসে দু’শ টাকা করে দেবে। সুনির্মল আপত্তি করে নি।

প্রায় এক বছর হয়ে এল অনিল সুনির্মল-নির্ধারিত বাড়িটিতে আছে। কিন্তু এখনও ও কেন বাড়ির সবাইকে আনছে না? এবার একটা নিশ্চিত উত্তর ওর চাইই। ওর বাসাতে কৃষ্ণনগর থেকে সেদিন শনিবার এসে খবরের কাগজের পাতায় খানিক চোখ বুলিয়ে একটু গড়িয়ে নিল বিছানায়। তারপর চা-আসতেই উঠে বসল। চায়ে চুমুক দিয়ে কথাটি পাড়ল, ‘দ্যাখ্ অনিল, আজ দু’বছর হয়ে এল একটা ব্যাপারে কিছুতেই তোকে রাজী করাতে পারছি না। বাড়ির সবাইকে বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কেন এখানে আনছিস না—কী অসুবিধা আছে, আজ বলতেই হবে। এ খামখেয়ালীপনা আমি আর সইব না।

অনিল চা শেষ করে কাপটা রাখতে রাখতে হেসে বলল, ‘তুই দেখছি ক্ষেপে উঠেছিস! সামান্য ব্যাপারটায় এত গোল কিসের? ও এখানে থাকাও যা, কলকাতায় থাকাও তাই। কাকা তো কতবারই বলেছেন, ‘ওদের নিয়ে যা তোর ওখানে। তোর মা-বাবাও যদি যেতে চান নিয়ে যা। আমার জন্য ভাবনা করিস না। নিরাপদ ছেলেটা সব কাজই পারে। রান্নাবান্না ভালই জানে। আমার তো একবেলা ভাত লাগে, ও বেলা রুটি। একবারেই তৈরী করে গরম কৌটোয় রাখলেই হল। আর আমিও তো রান্না জানি।’ সুনির্মল এবার সোৎসাহে বলল, ‘তাহলে দ্যাখ্, তোর অসুবিধার কথাটা কাকা পর্যন্ত কতটা অনুভব করছেন।’

অনিল হাসতে হাসতে উত্তর দেয়—আমার তো অসুবিধা কিছু হচ্ছে না। ওরাও তো বেশ আছে। আমি গিয়ে দেখে আসছি মাসে অন্তত দু’বার। তাছাড়া

ওখানে আমার ছেলেমেয়েকে দেখবার লোক বেশি, এখানে সে সুযোগ-সুবিধা কোথায়?

সুনির্মল উত্তর দেয়—'আমাব উপব তুই দেখছি ভরসা রাখতে পারছিস না। তোকে কথা দিচ্ছি আমার সংসারেব সবাই তোদের সাধ্যমত দেখবে। আর কথা নয়, এবার নিয়ে আয় ওদের।

দু'বছর পার হয়ে আরো তিন মাস কেটে গেছে। পরিবারকে কলকাতা থেকে অনিল আনেনি সিউড়িতে। যেমন চলছিল তেমনি চলছে তার সংসাব। অনিল প্রায়ই সুনির্মলকে বলে, 'আমি তো ভালই আছি। পরিবাবের সবাইও ভাল আছে। তুই এত ভাবছিস কেন?'

সুনির্মল এবপর আর আসেনি, অনিলকেও কিছু বলেনি। দক্ষিণ কলকাতার অনিলের ঠিকানা একসময় জেনে নিয়েছিল সে। দিন পনেরো বাদে এক শনিবার চলে এল সোজা ওদের কলকাতার বাড়িতে। পরিচয় পেয়ে অনিলের কাকা, বাবা-মা সবাই খুব যত্নে সুনির্মলকে আপ্যায়ন করলেন। অনিলের জন্য এত চিন্তা-ভাবনা দেখে ওবা বললেন, 'বাবা, তুমি যখন কাছে ছিলে ভাল ছিল। এখনও যাও, ওর খোঁজ-খবর নিচ্ছ দেখে অবাক হচ্ছি।' আমরা ওকে অনেকবার সপরিবারে যেতে বলেছি। ও কিছুতেই তা শুনছে না। আসল ব্যাপার হল ওর স্ত্রী বেশ কযেক বছর হল একেবারেই পঙ্গু পায়ের ব্যথায়। ডাক্তারবাবুর নির্দেশ, ওকে যেন বেশি নড়াচড়া না করানো হয়। সিউড়িতে যেতে হলে আমাদের সকলকেই যেতে হবে। বৌমার যাবার অসুবিধা তো আছেই, তার উপর ওর কাকার জন্য চিন্তা। তিনি চাইলেও অনিল তাঁকে একা ফেলে যাবে না। তাই ও কাউকেই আর নিতে চায় না, বাবা।'

'বাড়ির খোঁজ-খবর ও প্রায়ই নেয়। অনিল ভাল আছে, খবর পাই। গিয়ে দেখা আর আমাদের হয়ে ওঠে না। তুমি পুরানো বন্ধু যখন, একটু দেখো ওকে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

অনিলের কাকা ও বাবা সুনির্মলকে বনশ্রীর ঘরে নিয়ে এসে তার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শয্যায়, একটু উঠে বসে অনেক কষ্টে মুখে একটু হাসি এনে করজোড়ে নমস্কার জানাল বনশ্রী। হতবাক সুনির্মল করজোড়ে প্রতিনমস্কার জানায়, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে।

বৈশাখ শেষ হতে চলল। বাড়ির পিছনটায় একটা আমগাছে এখনও কোকিল ডাকছে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে দগ্ধ প্রাণীব হাহাকার তীব্র হয়ে ওঠে ওর ওই ডাকে। অনিল বুঝতে পারে না কোকিলের কণ্ঠে এ সংসারের সকলই কেন 'কু'।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

যোগেনের কাণ্ডকারখানা

“দাদাবাবু কোথায় গ্যাছেলেন”—দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে হাসিমুখে নমস্কার জানাচ্ছে একটি লোক। চলা থামিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখি মানুষটি আমার পরিচিত।

—“যোগেন না”?

প্রশ্নের উত্তরে জানায় সে, 'হ, আইছিলাম মধ্যমগেরাম হাসপাতালে। আমাগো নগেন ভাইয়ের ছেইল্যার পাও ভাঙছে ছাইকেল চালাইতে গিয়া। ভর্তি করতে হইল। পাশে দাঁড়ান নগেন নমস্কার জানায় মাথা নীচু করে। —'কতটা ভেঙ্গেছে? ডাক্তারবাবুরা কী বলছেন—তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে তো'? —“হ, বিশ, একুইশ দিন লাগ্‌ব ঠিক হইতে। গোড়ালির উপরে ভাঙছে বাঁ পাওয়ের। দুই ঘণ্টা বইস্যা থাইক্যা অহন ব্যাণ্ডেজুণ্ডেজ শ্যাষ্‌ হইল। আপ্‌নে ভাল আছেন তো?” ঘাড় নেড়ে জানাই বাহাত্তরে যতটা ভাল থাকা সম্ভব আছি।

যোগেনের সঙ্গে এইটুকু কথাতে শিবুদা সমস্ত ব্যাপারটার 'সার্‌ভে' করে ফেলেছেন এরই মধ্যে। গুস্তিয়ার এক সাহিত্যসভা থেকে ফিরছি শীতের সন্ধ্যায়। অটো থেকে নেমে কিছু পথ হেঁটে চৌরাস্তার মোড় পেরিয়ে আবার অটো, রিক্সা, ভ্যান যা পাওয়া যাবে তাতে চাপতে হবে মধ্যমগ্রাম স্টেশন পৌঁছতে। প্রথমটা হাঁটতে হাঁটতে পরে ভ্যানে চেপে অভিভূত শিবুদা যোগেন সম্পর্কে সপ্রশংস বেশ কয়েকটি কথা শেষ করে আমাকে বলার সুযোগ দিলেন। না, বোধ করি, মিলিয়ে নিতে চাইলেন তার অনুমানটি।

যোগেন কাঠের মিস্ত্রী—যতদূর জানি সৎ ও সরল। চল্লিশ বছর ধরে আমাদের এলাকায় অনেক কাজ করেছে। এখন আগের মত কর্মশক্তি নেই। অবসর নেবার প্রয়োজন থাকলেও ছেলেটা এখনও দাঁড়াতে পারেনি বলে কাজ করে। গতবছর একদিন একথা জানিয়েছে আমাকে। দুই ছেলে এক মেয়ের মধ্যে ছোট ছেলেটির কঠিন রোগে মৃত্যু ওকে কঠিন আঘাত হেনেছে। মেয়েটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়েছে, বিয়েও দিয়েছে—ভালই আছে। কিন্তু বড় ছেলেটিকে নিয়ে ও পড়েছে মুস্কিলে। মাধ্যমিক পাশ করার পর দুবার চেষ্টাতেও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হয় নি। পড়াশুনা ছেড়ে দিল। যোগেন অনেক বুঝিয়েও ওকে কাঠের কাজে আনতে পারে

নি। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা আর খেলাধূলায় দুচার বছর নষ্ট করল। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক মুদীখানায় কাজে লাগিয়েছে। এরই মধ্যে বারদুয়েক ছেড়ে আসার চেষ্টা। যোগেন আবার বলে-কয়ে ফিরিয়েছে।

পাশাপাশি ভাইয়ের সংসার। কাপড়ের ছোটখাট কারবার। তিনটি ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হিমসিম খেয়েছে। পড়াশুনার খরচ যোগাতে যখনই ঠেকেছে, জুগিয়েছে যোগেন।

নিজের টানাটানির সংসার। তার মধ্যে সে আবার ভাইয়ের পরিবারকেও সাধ্যমত দেখে। তাও না হয় আপন ভাই বলে তাদের দেখল, কিন্তু কারবারে শুধুমাত্র সহযোগীর জন্য ওর ভাবনাচিন্তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। দু'সপ্তাহ পরে একদিন ওর দোকানে খোঁজ নিয়ে শুনলাম ঐদিনও সে গেছে নগেন ভাইয়ের ছেলেকে দেখাতে ঐ হাসপাতালে।

মাস সাতেক পরের ঘটনা। বাজারে ওর ডেরাতে কাজ করছে। দেখে মনে হল অসুস্থ। থলিহাতে আমাকে দেখে কাশতে কাশতে হাসিমুখে কপালে দুহাত ঠেকিয়ে বলছে, ক'দিন দেহি না আপনারে, ভাল আছেন তো?

'ভাল আছেন' পাল্টা প্রশ্নটা করতে পারলাম না ওকে দেখে। 'শরীর খারাপ মনে হচ্ছে'—ধীরে প্রশ্ন করি। —'হ মাস্টারবাবু, দুইমাস খুব ভুগছি কাশি-জ্বরে। শরীলডায় যুত্ পাই না। সুবলের মায় শোন্‌ল না। আমারে বড় ডাক্তারের কাছে লইয়া গেল। অনেকগুলান টাকা খরচা হৈয়া গেল।'

এখনও তো ভাল করে সারেনি দেখতে পাচ্ছি। 'কিছুদিন বিশ্রাম নাও' কথাটা বলতে পারলাম না। বলতে হলও না। যোগেন বলল, 'আমারে কাজে আইতে মানা করে সুবলের মায়। আপনি কন, আমি বইস্যা থাকলে দিন চল্‌ব? পোলাডা যা হউক, নিজের ভাতের বন্দোবস্ত করছে। আমি দোকানডা খুলিয়া বসলে তবু তো নুন-ভাতের ব্যবস্থাডা হয়—কী কন?'' ব'লে আমার সমর্থন চাইল। ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাতে হল।

নগেনের ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করতেই উৎসাহের সঙ্গে জানাল, পোলাডার আর দুঃখ নাই। নগেন আসব অহনই। অর্ ভরসাতেই ত আসি, মাস্টারবাবু।

পোলাডা লেখাপড়ায় ভাল। আমি কই, তুমি ভাল মাস্টার দাও, ও আরো ভাল কর্‌ব। আমার কথা শোনে না। এইবার এইট্ পাশ কর্‌ব। নাইন থেইক্যা তো বাল কোচিং-এ দেতে হইব। আমি দ্যাবাশিস্‌বাবুরে কইয়া রাখ্‌ছি—মায়নাটার একটু কন্‌ছেসন্ করেন যানি। রাজি হইছেন। উনি বল্‌ছে, পড়াশুনায় যখন ভাল, তোমার টাকাপয়সার চিন্তা করতে হইব না। তবে পড়ায় ফাঁকি চল্‌ব না। তিনির দয়ার শরীল, মাস্টারবাবু। বলতে বলতে ওর গলা ধরে যায়, চোখে জল আসে।

কাজের অজুহাতে মাস তিনেক বাইরে কাটাতে হল। হিমালয়ের হাতছানি যে অজুহাত সৃষ্টিতে রসদ জুগিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এরপর লেখাপড়ার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলাম দু'মাস।

হঠাৎ একদিন বাজার-ফেরতা যোগেনের খোঁজ করতে ওর দোকানে আসি। দেখি নগেন কাজ করছে। যোগেনের খোঁজ করতেই নগেন জানায় 'মাস্টারবাবু, তিনমাস হৈল যোগেন বিছানায় শোওয়া—ওঠতে পারে না। কাশি-জ্বর-হাঁপানি। কাশিডা একটু কমছে, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়—কিন্তুক হাঁপানিডা বাড়ছে। শ্বাস লইতে কষ্ট খুব।'

নগেনের কথায় মনটা বিষণ্ণ হল। আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে চলে এলাম। দু'দিন বাদেই ওর বাড়িতে গেলাম। সুবল চিনেছে আমায়। ঘরে নিয়ে বসাল। যোগেন ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ছে দেখে কাছে এসে ওকে থামাই—'আরে, আপনি উঠবেন না একদম। এইতো আমি বসেছি।' ওদিকে আওয়াজ পাচ্ছি আমাকে চা-খাওয়ানোর চেষ্টা চলছে। চা-বিস্কুট নিয়ে ছেলে ঢুকল একটু পরেই। পিছনে গৃহিণী প্রথমে করজোড়ে নত মস্তকে নমস্কার ও পরে সামনে এসে প্রণাম করে। যোগেনকে খুবই শীর্ণ ও দুর্বল দেখাচ্ছে। ওরা চলে গেলে হাসিমুখে বলছে আমার খোঁজ লইতে আসছেন, কী সৌভাগ্য! হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানায় নতমস্তকে। হাত দিয়ে চোখের জল মোছে। ওর দুঃখের কথা জানাল। সুবল দোকানের কাজ ছেড়ে দিয়েছে তিনমাস আগে। অন্য কিছু করে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই মাথায় মৃদু করাঘাত করে বলে—কপালডায় নাই সুখ। মাস্টারবাবু—চ্যাষ্টা কম করি নাই। আপনে জানেন সবই। কত বুঝাইলাম, কামডা ছাড়িস না। সংসারডা অচল হৈয়া পড়ছে—সুবলের মায় কত কষ্ট করিয়া চালাইত্যাছে। যা সামান্য আয় হয়, ভাগ করিয়া লই। রোজগারপাতি খুবই কম, মাস্টারবাবু। আমি খাড়াইতে পারলে কাজ পাইতাম অনেক।'

ওর কথা খুবই ঠিক। আমি দেখেছি যোগেন মিস্ত্রীকে সবাই চায়। কিন্তু নগেন তো তেমন কাজ পাবে না। যোগেনকে লোকে নিশ্চিন্ত মনে কাজে লাগায়। ওর কাজ শুধু নয়, যোগেন মানুষটিকেও সবার পছন্দ। কিন্তু ছেলেটি এমন করছে কেন বুঝে উঠতে পারছি না। লেখাপড়া শিখলে অন্য কাজের চেষ্টা করা যেত। কিন্তু সেদিকে তো গেল না। কাঠের কাজটা শিখলে যোগেন ওকে অনেক বাড়ির কাজ ধরিয়ে দিতে পারত। বুঝল না ছেলেটা। এখন ও কী করবে, কে জানে! কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ক্ষীণকণ্ঠে তবু জানাল—অর্ মায়ের কথা এট্টু শোনে। ইস্কুল ব্যাগের সিলাইয়ের কাজ করে মায়, সুবল মালিকের বাড়ি থেইক্যা দেওয়া-নেওয়ার কামডা করে।

আমি বললাম, 'বেশ তো, ওই কাজই করুক ওর মায়ের সঙ্গে। মায়ের কাছে বসে দেখতে দেখতে ও কাজ শিখে যাবে। ভাবিষ্যতে নিজেও ঐ কাজ ও করতে পারবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে পড়াশুনা একেবারেই ছেড়ে দিল সুবল। যোগেন অনেক বলেছে পড়ানোর সব ব্যবস্থাই সে করবে। কিন্তু সুবল পড়বে না বলে দিয়েছে।

নগেনের ছেলে তপন এবার নবম শ্রেণীতে উঠবে। গতবার প্রথম পাঁচজনের মধ্যে ছিল। এবারও ভাল ফলই করবে, যোগেন জানাল। নতুন বছরে কোথায় কোথায় প্রাইভেট পড়বে, সবই যোগেন ব্যবস্থা করে ফেলেছে। নগেনকে বলেছে, 'তুমি লক্ষ্য রাখবে ঠিকমত পড়তে যাচ্ছে কি না। সময়মত ফিরছে কি না। যাদের সঙ্গে যাচ্ছে সেই ছেলেগুলি ভাল কি না—এসব দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তপনের বাবা-মাকে। সব ব্যাপারে নগেন যোগেনের উপর খুবই নির্ভরশীল। অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের কথা নগেনকে বললেও লক্ষ্য করেছি যোগেন নিজেই সেই দায়িত্ব পালন করেছে। এখন শয্যাশায়ী হওয়াতে তপনের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন সে। কতদিনে ও সেরে উঠবে সেই ভাবনায় ও অস্থির। পরে জেনেছি ওর অসুখটা কঠিন, দুরারোগ্য। পুরো চিকিৎসার ব্যয়ও অনেক— সাধ্যের বাইরেই বলা চলে। যোগেনকে এসব কিছুই জানান হয়নি।

আজ পয়লা বৈশাখ, নববর্ষ। যোগেনের দোকানে গণেশ পূজার আয়োজন হয়েছে। অসুস্থ হলেও যোগেন এসেছে। বাড়ির সবাইকে দেখলাম। পূজো শেষ হলেই যোগন বাড়ি চলে যাবে। কাশি-হাঁফানি রয়েছে। দেখা হতেই নমস্কার জানায়। নগেন এগিয়ে এসে বসতে বলে। আমি বললাম, 'বাজার হাতে তো বসতে পারব না।' তবু দু-চার মিনিট বসতে হল। যোগেন আনন্দের সঙ্গে জানাল, তপন এবার পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে। পড়া ঠিকমত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ওরই নির্বাচিত গৃহশিক্ষকদের কাছে। যোগেনের রোগক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এ হাসি, না প্রশান্তি! কোথা থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসছে—"পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের পানে আসি।"

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

শূন্য ও সমরজিৎ

সমরজিৎবাবুর এমন প্রশান্ত আনন্দরসে নিমগ্ন মূর্তি আগে কখনো দেখি নি। সবচেয়ে বড়কথা, পৌত্র সুলোচন স্কুলের গত ইউনিট টেস্ট্ পরীক্ষায় অঙ্কে শূন্য পাবার পরও তাকে ঘিরেই আনন্দে ডগমগ। ভয়ে ভয়ে প্রথমটা কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় নি। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর সাহস হল। বললাম, কী দাদা, এত স্ফূর্তি কিসের? নাতি ভাল পাশ করেছে বুঝি?

নাতিকে কাছে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, শূন্য শূন্য ভায়া, সব শূন্য। তুমি শূন্য, আমি শূন্য, নাতি শূন্য! বুঝলে না? এই শূন্য থেকে যত খুশী নিতে পার, শূন্যই থাকবে।

আমি থমকে গিয়ে বলি, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব গোলমাল করে দিচ্ছ দেখছি। কথাটা ত শূন্য নয়, 'পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলেও পূর্ণই থাকে।'

সমরজিৎ মাথা ঝাঁকিয়ে আমার দিকে চেয়ে নাতিকে ছেড়ে বললেন, একই কথা, পূর্ণও যা, শূন্যও তাই। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে তো শূন্য থাকে—এ তো জলজ্যান্ত আমি, তুমি সব সময় দেখছি। অথচ বলা হচ্ছে 'পূর্ণ' থাকে। তাহলে কথাটা দাঁড়াল 'পূর্ণ' মানেই শূন্য, শূন্য মানেই পূর্ণ। আর এই জগতে চারদিকে চেয়ে দেখ—ক্রমে সব শূন্য হচ্ছে। রামহরি চাটুজ্যে মরল, নবীন বাড়ুজ্জেও সেদিন বিদায় নিলেন, আর ব্রাদার বরদাকান্ত ত তার গোটা সংসারটাকে শূন্য করে পরলোকে গেলেন।

আমি সমরজিৎ-এর আবিষ্কৃত নবীন তত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারলাম না। বিশেষ করে অস্বীকার করবার চেষ্টাতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশী। সমরজিৎবাবু বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। অবসর নেবার পর অঙ্ক নিয়ে দিনরাত নানা গবেষণা করছেন। আট-দশ বছর হল বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-ভাগবত, যোগশাস্ত্র পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে তত্ত্বকে খুঁজে নিয়ে তাকে অঙ্কের ফর্মুলায় বেঁধে ফেলেছেন। কোনমতেই তত্ত্বের আর পালাবার পথ নেই।

আনন্দে একদিন বিশ-পঁচিশ জন বন্ধুবান্ধবকে ডেকে মিষ্টিও খাওয়ালেন।

আমি অঙ্কে চিরকালই কাঁচা। আমাকে বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করেছেন। কিছুক্ষণ

মনোযোগ দিয়ে বুঝবার চেষ্টার পর ক্লান্তি আসে। একটু অন্যমনস্ক হতেই খপ্ করে হাত ধরে টেনে নিয়ে আবার বোঝাতে শুরু করেন। এবার মাথা নেড়ে বলতেই হয় 'বুঝেছি'। বিজ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকগণ বুঝবার চেষ্টা করেছেন। কেউই শেষ পর্যন্ত পৌছতে পারেন নি। অনেকটা এগিয়েও আইনস্টাইনকে থামতে হয়েছে। সেই 'yet to discover'-এর সমধান করেছেন বলে সমরজিৎ অনেক জায়গাতেই তাঁর আবিষ্কৃত-তথ্য মুদ্রিত আকারে পাঠিয়েছেন। কিছু সম্মানও পেয়েছেন দু'একটি কেন্দ্র থেকে। কিন্তু তাঁর দুঃখ আজকালকার ছাত্ররা বুঝতে চায় না এসব তত্ত্ব।

সমরজিৎ তাঁর আবিষ্কৃত ঐ তত্ত্বে বা ফর্মুলায় নিজে খুবই তৃপ্ত, এটা জানি। কিন্তু আজ উপনিষদের "ওঁ পূর্ণমদঃ" তত্ত্বটিকে পুরো উল্টে নিয়ে যে ব্যাখ্যায় মেতেছেন, তাতে ভাবনা হচ্ছে!

কথাবার্তায় অন্যান্য প্রসঙ্গে, চলাফেরায় কোন অসঙ্গতি নেই, প্রকৃতিস্থই আছেন বলা চলে। নাতিকে বলছেন 'তুমি চেষ্টা করে যাও, কুড়িতে কুড়ি, একশতে একশ পাবে।' চিন্তা করো না, শূন্য পেলেও ক্ষতি নেই—এক সময় না এক সময় পূর্ণ পাবে।' সুলোচন হাঁ করে শুধু ঠাকুরদাদার দিকে চেয়ে থাকে।

আমাকে ডেকে নিয়ে ওর বাইরের ঘরটায় বসালেন। নানা কথার ফাঁকে ঘুরে-ফিরে এল ওঁর শূন্য তত্ত্ব।

এরপর মাসখানেক নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে সমরজিৎবাবুর কোন খোঁজখবর নিতে পারিনি। সেদিন বেলা দশটায় বারাকপুর যাবার পথে একবার বাড়ির কাছে যেতেই দেখি বাইরের বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন। 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করতেই কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'ফার্স্ট ক্লাস্—খুব ভাল। আপনি ভাল আছেন তো?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'বাড়িতে একটু অসুখ-বিসুখ-অশান্তি রয়েছে—আমি ভাল আছি।' সমরজিৎ আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেন, 'আমার ফর্মূলাটা নিয়ে তোমরা ভাবলেই না। ওটা বাড়ির সবাইকে বোঝালেই সব অশান্তি কেটে যেত।' আমি একটু ভয় পেয়েই ও প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করি— দেশের অবস্থা কেমন বুঝছেন সমরবাবু?

সুযোগ পেয়ে সমরবাবু আক্ষেপের সুরে বললেন, 'মস্ত সুযোগ ছিল। এদেশ তো অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর একটু এগুলেই ঐ পূর্ণতা বা শূন্যতায় পৌছতে পারত। কিন্তু কী সব অর্থহীন বৈঠক জল্পনা-কল্পনার দিকে চলেছে! হতভাগ্য দেশে শান্তি আসবে কোত্থেকে? আমার ফর্মুলার কথাটা রাইটার্স-এর

এক চাকুরে ছাত্রকে বলেছিলাম। কথাটা ওরা প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিল। কেউ কিছু মানতে চায় না—এই হল মুস্কিল! ভাল-আসার পথ জুড়ে বসে থাকলে ভালটা আসবে কোন্ পথে শুনি?'

সব শাস্ত্র ঘেঁটে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে যত গভীরে প্রবেশ করছেন ততই আনন্দসাগরে ভাসছেন সমরজিৎ। তাঁর সান্ত্বনা—এ আনন্দ কেউ কোনোদিন কেড়ে নিতে পারবে না।